ময়নাতদন্তহীন একটি মৃত্যু

ময়নাতদন্তহীন একটি মৃত্যু

মানস চৌধুরী

বাঙলায়ন

Lv‡`gj Bmjvg
meZ AMw÷b †Mv‡gR
mgb ingvb
kvnxb AvLZvi

Avgvi mvwnwZ¨K-evÜe‡`i Kv‡Q bvbv fv‡e Avwg FYx

ISBN 9847008500627

ময়নাতদন্তহীন একটি মৃত্যু। মানস চৌধুরী
প্রকাশক: বাঙলায়ন-এর পক্ষে অস্ট্রিক আর্য্।
৬৯ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ: ফাল্গুন ১৪১৬। ফেব্রুয়ারি ২০১০
প্রচ্ছদ: মানস চৌধুরী

Moynatodontoheen Ekti Mrityu. *Stories by* Manosh Chowdhury
Publishedy Austrik Arzu on behalf of Banglayan
69 Pyaridas Road, Banglabazar, Dhaka
First published: February 2010
Tel: 880-2-7452831
Cell: 01197143570, 01815001752
Email: banglayan@gmail.com
Web: www.banglayan.com

মুল্য: ১৬০ টাকা Price: € 5

[এই পান্ডুলিপির গল্পগুলো সব জুন, ২০০৪ থেকে মে, ২০০৫-এর মধ্যে রচিত
এবং ওয়েব প্রকাশনী স্বপ্নছেঁড়া থেকে রুহুল কুদ্দুস কর্তৃক ডিজিটালি প্রচারিত]

লেখক পরিচিতি

মানস চৌধুরী গল্প লিখতে শুরু করেছেন প্রবন্ধের থেকে এর প্রকাশনা সহজ হতে পারে এই ভেবে, ২০০২ সালে। প্রথমে সেটা মনে হলেও পরে আর প্রকাশনা সহজ মনে হয়নি তাঁর। লোকের সঙ্গে আলাপ করেও খুব ভাল তিনি বোঝেন না কীভাবে দৈনিকে কিংবা পুস্তকে প্রকাশককে রাজি করানো সম্ভব। এরই মধ্যে লিখে শেষ করার ৪ বছর বাদে তাঁর পয়লা গল্পগ্রন্থ *কাকগৃহ* প্রকাশিত হয়, ২০০৮ সালে, পাঠসূত্র থেকে। সম্পূর্ণ প্রস্তুত দ্বিতীয় এই পাণ্ডুলিপি ৪ বছর অপ্রকাশিত থাকার পর ইলেকট্রনিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় পাণ্ডুলিপি *আয়নাতে নিজের মুখটা* এবছরই বাঙলায়ন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা তাঁর পেশা। পাশাপাশি সংবাদ-আলোকচিত্র ও মিডিয়া অধ্যয়নে লম্বা সময় পড়িয়েছেন। বিদ্যাজগতে তিনি মোটামুটি প্রকাশিত লেখক। *ডিপার্ট* নামে একটি ইংরেজি শিল্পকলা পত্রিকাতে সম্পাদকীয় পর্ষদে কাজ করছেন।

গল্পসূচি

আলী বিহারীর কম্বল.....০৯
কুমড়া.....১৯
একটি [জাপানী] মোরগ কাহিনী.....৪০
ওস্তাদ.....৫০
পাখিসংক্রান্ত একটা গল্প.....৬১
সাহেবালির ঘোড়ারোগ.....৭২
বিরুদ্ধাচরণ.....৮৫
ময়নাতদন্তহীন একটি মৃত্যু.....৯৬
দাড়ি কামাবার জন্য শুভক্ষণ.....১০৬

আলী বিহারীর কম্বল

কম্বলটা গায়ে দিয়ে আমি শুই। অথচ প্রতিবারেই মনে হয় কম্বলটাই আমাকে চাপা দিয়ে পড়ে আছে। এই ভারী অনমনীয় দুর্বিনীত বস্তুপিÊটি বুকের ওপর থাকলে প্রতিরাতেই আমার মাঝপথে ঘুম ভেঙে যায়। আমি হাঁসফাঁস করতে থাকি। এটাকে কম্বল বলে ভাবাই মুস্কিল। এই এতগুলো বছরেও, আমার নানাবিধ আত্মপ্রবোধ রচনা সত্ত্বেও, এটাকে কিছুমাত্র কম্বল হিসেবে নিতে আমি পারিনি।

কম্বলটা কেনা হয়েছিল ৫০ টাকায়।

আলী বিহারী ওর স্ত্রীকে নিয়ে বিকেলে আমাদের বাসায় এসেছিল। বাইরে রকে তখন মাদুর পাতা। বাবা ওদেরকে সেই মাদুরে বসতে দিয়ে মাকে বাইরে আসতে বলেছে। সম্ভবতঃ কম্বলটা সরেজমিনে দেখাতে। আবার এও হতে পারে, দাম-টাম নিয়ে দুরূহ লেনদেনটাতে মা অংশ নিক বাবা তাও চাইছিল। আমরা মাদুরে বসে আলী বিহারীর দিকে তাকিয়ে আছি। সত্যি কথা বলতে ওর চোখের দিকে। ওর স্ত্রী আমাদের—আমি আর আমার বোন—দু'জনকে দেখে কিছু বলবে ভাবছিল বোধহয়। তেমন কিছু বলা হয়নি। কেবল বাবাকে জিজ্ঞেস করল 'এ দুইটো?' বাবা জোরাল গলায় বলল 'এইতো তোমাদের দোয়ায়।' আলীর স্ত্রী দোয়া করবার একটা বাংলা বাক্য শুরু করেও আগাতে পারল না। মা বাইরে চলে এল।

ভাঁজ-করা কম্বলটা আলীর স্ত্রী সুফিয়ার বাম পাশে রাখা। আলীকে সুফিয়া তার ডান পাশে দেয়াল হেলান দিয়ে বসিয়েছে। আমি মাদুরে আধ-পাছা ঠেকিয়ে রকের বাইরে পা ঝুলিয়ে বসেছি। ঘরে ঢুকবার যে দরজা সেই দরজার জায়গাটুকু ছেড়ে দিয়ে সুফিয়ার মুখোমুখি বাবা দাঁড়িয়ে। তার পাশে রাখা চেয়ারটাতে বসে আছে বোন, পা দোলাচ্ছে। চেয়ারের পাশে দরজার চৌকাঠের সঙ্গে ঠেস দিয়ে আলীর লাঠিখানা রাখা। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে মাদুরের বাইরে পায়ের পাতার উপর বসে মা কম্বলটা ধরে দেখল। আমাদের

সকলের চোখ তখন কম্বলটার দিকে। কেবল সুফিয়া আর আলী ছাড়া। সুফিয়া তাকিয়ে একদম মায়ের মুখের দিকে। ওর ছোট ছোট চোখদুটো গভীর মনোযোগে আরো ছোট হয়ে গেছে। আর আলী কোথাও তাকিয়ে নেই। মা কী বলে তা শোনার জন্য ওকে উদগ্রীব মনে হলো। ওর পিঠ এবং ঘাড় তখন সোজা। মা দুই প্রস্থ ভাঁজ খুলে দেখল। হাতের উল্টো পিঠ কম্বলের গায়ে ঘষল। তারপর সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল '৫০ টাকাই দিতে হবে? কম কিছু দিলে হয় না?' মানে দামের এক রকমের রফা বাবার সঙ্গে আগেই আলীর হয়েছিল। মা'র কথায় সুফিয়া তেমন কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। তার আগেই মা উঠে দাঁড়াল। বাবাকে বলল 'খুলে একটু দেখে নাও।' আলী হেলান দিয়ে বসল আবার। মা ঘরে গেল। আমি জানি মা সুজি বানাচ্ছে ওদের জন্য।

এইমাত্র যে কম্বলটা কেনা হলো, যদিও এই কেনায় আমার কোনোরকম কথাবার্তা পছন্দ-অপছন্দের বালাই নেই, সেটা কিন্তু আমার জন্যই কেনা হলো। পুরোটা সময় মাদুরে আধ-পাছা বসে থেকে চোখের কোণা দিয়ে আমি কম্বলটাকে দেখতে থাকলাম। মা উঠে দাঁড়াবার পর, যখন এটা না-কেনার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকল না, তখন একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমি আমার বোনের দিকে তাকালাম। সমস্ত ঘটনায় সেই একমাত্র নির্লিপ্ত দর্শক। এমনকি এই যে আমার হতাশা সেটাও যে ও খুব একটা লক্ষ্য করল তা আমার মনে হলো না। সুজির জন্য অপেক্ষা ছাড়া আমি আর ভাল কিছু তখন মনে করতে পারলাম না। এই আধা ঘণ্টা আগেও আমি মনে মনে ভেবেছি আলী বিহারী না এলেই হয়। আবার ভেবেছি হতেও তো পারে দারুণ একটা কম্বল। বুকের সাথে একহাতে ঠেসে এই কম্বলটা সমেত সুফিয়াকে ঢুকতে দেখেছি আমিই। তখন থেকে আমার আর মাদুরে আরাম করে বসাই হলো না।

এ কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে কম্বলটা আমার একেবারেই পছন্দ হয়নি।

একজন ধুনকার যেবার আমাদের বাসায় এসেছিল সেবার আমার জন্য লেপ বানানো হয়নি। সে ক' বছর আগের কথা। বোনটাও তখন বেশ ছোট, ওর জন্য আলাদা করে কিছু করার প্রশ্নই আসে না। আর আমার তখন একটা লেপ ধরনের জিনিস ছিলই। মা-বাবার লেপটা তখন চিমসে গেছে। ধুনকার এল। এসে উঠোনে পেতে দেয়া বড় একটা হোগলায় বসে গম্ভীর মুখে সেই চিমসে লেপের সেলাই খুলতে লাগল। পাশে স্পঞ্জের স্যান্ডেলটা খুলে রেখেছে। স্যান্ডেলটার সাদা বুক জোড়া গোড়ালিতে আর বুড়ো আঙুলের ধারে ক্ষয়ে গিয়ে উৎকট একটা নীল রঙ বেরিয়ে এসেছে। গোড়ালি দুটোই বেশি ক্ষয়ে গেছে। তার মধ্যে ডান পায়েরটার খানিক অংশ পাতলা হয়ে ভেঙে গেছে। ওখান থেকে ওর পা বেরিয়ে মাটিতে ঠেকবার কথা। আর বাম পায়ের ফিতেটা সামনের মধ্যখানে বোধহয় ছিঁড়ে গেছিল। সেখানে একটা তার দিয়ে বাঁধা। একটা স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরে আমিও তার ধারে কাছে বসে দেখছি। আমার গায়ে হাতা-কাটা একটা স্যান্ডো গেঞ্জি। আমি একবার ওর লেপের সেলাই খুলতে দেখি, একবার ওর স্যান্ডেল দেখি। ধুনকার সেলাই খোলার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে দেখছে। লেপের সেলাই খোলা হয়ে গেলে ও বালিশের খোলগুলো খুলতে শুরু করে। বালিশ ছিল চারটা। বাবা কিংবা মা কেউই দুটো করে বালিশ ছাড়া ঘুমাত না। মা কোথায় ছিল খেয়াল করিনি। বালিশ খুলতে লাগার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে ডেকে নিয়ে গেল—'ভেতরে চল। তুলায় এখনি হাঁচতে শুরু করবি।' খুব একটা ইচ্ছে আমার হচ্ছিল না, কিন্তু অগত্যা মার সঙ্গে ঘরের মধ্যে যাই। আর একটু পর পর নানান উসিলায় বাইরে এসে ধুনকারের কাজ দেখি। প্রায় বিকেল পর্যন্ত ছিল সে। তুলা ধুনল। তারপর আবার বালিশে ভরে সেগুলো সেলাই করল। এর মধ্যে দেখি লাল রঙের নতুন কাপড়ের খোল বের করে মা তাকে দিল। সেই নতুন লাল রঙের কাপড়ের মধ্যে ধুনে-রাখা তুলা ভরে একদম নতুন-দেখতে একটা লেপ ও বানাল। লেপের সেলাইয়ে অনেক সময় লাগল তার। সে অনেক দিন আগের কথা।

আমি চাই বা না চাই, বোনটা ঘুমাত ওই লেপের মধ্যেই, মা-বাবার সঙ্গে। আর আমার লেপটা আমারই ছিল। ছোট খাট একটা জিনিস। কিন্তু লেপই। সাদা মার্কিন কাপড়ের ঢাকনা লাগানো, ছাপানো কাপড়ের খোল। তার ভেতরে পর্যাপ্ত তুলার একটা পরিষ্কার লেপ। আমি যখন আরো ছোট তখন শখ করে আমার কথা ভেবেই ওটা বানানো হয়েছিল। শীতের সময় লেপের মধ্যে ঢুকেই আমার মাথা মুড়ে ঘুমানোর অভ্যাস। এটা প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ছিল যে আমি ওভাবে ঘুমাব আর বাবা খানিক পর এসে লেপ নামিয়ে আমার মুখ-নাক বের করে দেবে। বাবা এটা করত আমার দম বন্ধ হয়ে যেতে পারে সেই ভয়ে।

পরের বছরগুলোতে কখন যেন ওই লেপ থেকে পা বের হয়ে যেতে শুরু করেছিল। লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাতে গেলেই আমার পা বের হয়ে যায়। ফলে মুড়ি দিয়ে ঘুমানো আমার বন্ধই হয়ে গেছিল প্রায়। সেই হিসেবে বাবা কিংবা মায়ের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল খুশি হয়ে নতুন কোনো ব্যবস্থার কথা চিন্তা না করা। কিন্তু ঘটেছে উল্টো। আমার একটা লেপ লাগবে—এই চিন্তায় তারা পুরো একটা শীতের মৌসুম কাটাল। তাদের চিন্তা দেখে, পরিবারের একজন বিচক্ষণ সদস্য হিসেবে আমিই বরং নানা সময়ে আশ্বস্ত করেছি। আমার সেই আশ্বস্তিতে ওরা স্বস্তি পায়নি। আবার একজন ধুনকারকে বাসায় ডাকাও হয়ে ওঠেনি। বিষয়টা কেবল ধুনকার ডাকার ছিল না। ওই লেপে যদি নিশ্চিন্তে আমার পা ঢোকাতে হয় তাহলে কিছু তুলাও ওতে জুড়তে হবে। সেটা আমি বুঝতাম। মা কিংবা বাবাও বুঝত। আর খোল-নলচে, মানে খোল আর ঢাকনাও বদলাতে হবেই। দু' চারদিন, আমার মনে পড়ে, বাবা এসে মাকে খবর দিত 'কাপাশ তুলার শুনলাম ৮০ টাকা সের।' শিমুল তুলার প্রতি কোনোরকম ভক্তি শ্রদ্ধা বাবার কোনোকালেই ছিল না। কেবল একবার বাবার হাত ধরে বাজারে যাবার সময় পাড়ার শেষ মাথায় মোড়ের ধারে যে পরিত্যক্ত মাঠখানা, তার মধ্যে খেয়ালীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা চৈত্রমাসের শিমুল গাছটার পাগল-করা লাল ফুল দেখিয়ে বাবা বলেছিল—

'দেখেছিস বাবা কী সুন্দর ফুল।'

'বাবা ওটা নাকি শিমুল গাছ। তো শিমুল গাছে তুলা হয় না?'

'হয় তো। এই ফুলের পর ফল হবে। সেই ফল পাকলে তুলা হবে। তখন পাকা ফল ফেটে তুলা উড়বে।'

'ফল ফেটে তুলা হবে?' আমি তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করি।

'তুই মনে করেছিস তুলাই ফুল।' বাবা আমার মনের কথা ধরে ফেলে।

'তাইলে তুলা ধরে কীভাবে? বিক্রি করে কীভাবে?'

বাবার পান-খাওয়া মুখে তখন কৌতুকের হাসি। কথা শিখতে যে ক'দিন দেরি করেছিলাম, শুনেছি, সেটা বাদ দিয়ে আমার জন্মের পর সারাক্ষণ তার এইসব প্রশ্নের মধ্যেই থাকতে হয়েছে –

'ওড়ে তো অল্প কয়েকটা। বাকিগুলা গাছে চড়ে পাড়ে। তুলা উড়বে যখন খুব সুন্দর দেখাবে, দেখিস।'

ব্যাখ্যা করতে করতে রাস্তা দিয়ে আমাকে হাত ধরে নিয়ে চলে। আর তুলা উড়বার মৌসুমের জন্য মনে মনে একটা অস্থির অপেক্ষা সমেত আমি বাবার হাত ধরে হাঁটতে থাকি। সেসব আরো আগের কথা।

একদিন বাবাই সমাধান নিয়ে বাসায় ফিরল। ফিরেই মা'র সঙ্গে সেই আলাপ—

'রিলিফের কম্বলগুলা তো মোটা মোটা। খুবই গরম। কী বল?'

'রিলিফের কম্বল পাবা কই?'

"কেমন হয় আগে বল।'

'ভালই তো হয়। কে দেবে?' মা তাড়াতাড়ি সমাধানে পৌঁছাতে চায়।

'গÊগোলের পর হলে তো হাত পেতে দাঁড়াই গেলেই হতো। এখন তো আর আমাকে দেবে না।'

এসব আলাপে বাবার রসিকতার জুড়ি নেই। মা বরাবর।

'দাঁড়াও গিয়া।'

'তাইলে কী বল! একটা জোগাড় করি তাইলে।'

'সেইটাই তো জিগ্গাস করলাম।'

'দেখি আলীকে ব'লে। ও তো দুই তিন সিজনে একটা কম্বল পায়। দেখি কী বলে।'

বাবা এমন একটা ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল যে মনে হবে ভীষণ একটা অনিশ্চিত উপায় এটা। কিন্তু বাবাকে চিনলে ঠিকই বোঝা যায় যে আসলে সে নিশ্চিত। মাও তাই বুঝল। বাবার স্কুলে আলী পিয়ন।

কম্বলটার রঙ ভালুকের মতো। অমসৃণ রোঁয়াগুলো নারকেলের ছোবড়ার মতো ধারালো হয়ে বেরিয়ে আছে। ওটাতে হাত দিলেই বোঝা যায় ঢাকনা ছাড়া এটা গায়ে চড়ানো অসম্ভব। আর কম্বলে ঢাকনা চড়াতেও আমাদের বাসায় বিশেষ বাধা নেই। ফলে আবারো মার্কিন কাপড়ের একটা ঢাকনা বাসায় এল। কিন্তু সেই কাপড় ভেদ করেও রোঁয়াগুলো খালি গায়ে খোঁচা দেয়। কম্বলটাকে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দিলে অভ্যাগত কারো ঘরের দেয়ালের হার্ডবোর্ডই মনে হবে। বলে না দিলে সেটাকে কম্বল বলে চেনা মুস্কিল। শীতের হাত থেকে বাঁচতে যে মানুষ ওই কম্বলে ঢোকে তার শরীরের ভাঁজ নিয়ে কম্বলের এতটুকু মাথাব্যথা নেই। শরীরের সঙ্গে সে বিশেষ ছুঁয়েও থাকে না। বরং পানি-ভেজানো হার্ডবোর্ড যতটুকু নেহায়েৎ-অনিচ্ছাহেতু মোচড়াবে ততটুকু মুচড়ে ওটা গায়ের ওপর পড়ে থাকে। ফলে ওটাকে গায়ে নিয়ে বড়জোর মনে হয় একটা তক্তার নিচে চাপা পড়ে আছি। দুর্ভেদ্য সেই কম্বল ভেদ করে অনায়াসে যা আসা যাওয়া করত তা হচ্ছে শৈত্য এবং বাতাস। এই এতকিছু আমার কম্বলটা গায়ে দিয়েই বুঝতে হয়েছে। কিন্তু প্রথম দর্শনেও কম্বলটার প্রতি কিছুমাত্র নৈকট্য বোধ করবার হেতু ছিল না। অথচ কম্বলটা আমার জন্যই নেয়া হয়েছিল।

তক্তাটাকে আমার আরেকটা চলনসই লেপের সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়েছে ঢাকায়। এর ভিন্ন বিশেষ কোনো উপায়ও ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে দুঃসাধ্য একটা ব্যবস্থাপনায় ওই কম্বলের তেমন কোনো বিকল্প আসলে ছিলও না। লেপের সঙ্গে একটা বাড়তি, অথচ প্রয়োজনীয়, ব্যবস্থা রাখবার জন্য কম্বলটাই ছিল সম্বল।

বছরের পর বছর যাচ্ছে। নিয়তির মতো এই কম্বল থেকে গেছে। এই কম্বল আমার হকিকত।

চাকরি করি যখন তখনো এই আলীর রিলিফের কম্বল আমার সঙ্গী। আমি জানি এর হাত থেকে নিস্তার পেতে পেলব তুলতুলে কম্বল একটা আমার কিনতে হবে। নানাভাবে সেটা হয়ে উঠতে পাঁচটা বছর আমার চাকরিতেও কেটে গেল। তারপর গুলিস্তানের ফুটপাত থেকে একদিন রঙিন তুলতুলে একজোড়া কম্বল কিনে আনা হলো। শেষমেশ একদিন জামালের মাকে ডেকে এই কম্বলখানা গছিয়ে দিই। আমার বর্জ্য জিনিসেও ও খুব খুশি। আমি খুশি হই কম্বলটার বিহিত করা গেল বলে। আর জামালের মায়ের মতো নিশ্চিত বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা আমাদের জীবনে আছে বলে। অনেক দ্বিধা সমেত মাকে চিঠি লিখে জানাই ওই রাতেই। আমি নিশ্চিত মা একদমই খুশি হবে না। কিন্তু আলীর কম্বল থেকে আমি পরিত্রাণ পেলাম।

সারিতা সহ মুরগির টিক্কা কাবাব খেতে গেছি মোহাম্মদপুর বিহারী ক্যাম্পে। এটা আমার অত্যন্ত প্রিয় জায়গা, খাবার জন্য। সাউন্ড বক্স লাগানো ক্যাসেট প্লেয়ারে মেহেদি হাসান বাজছে—'মুঝে তুম নজরসে গিরা তো রহে হ্যায়, মুঝে তুম কভি ভি ভুলা না সাকোগি...।' শুকনো মুখে রশিদ এসে জিজ্ঞেস করে—

'ভাল সময়ে আসছেন। কী খাবেন ভাই। আইজকাও মুরগি?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনার কী হয়েছে?'

'মুন্তাকিম ভাইরে মাইরা ফালাইছে।'

চকিতে সামনের দোকানে তাকাই। তখনো কাপড়ে লেখা ঝুলছে 'বিসমিল্লাহ্ কাবাব'। মুন্তাকিমের ভাই মনোযোগ দিয়ে গোশ্‌তে মশলা মাখাচ্ছে। উজ্জ্বল দুইশ ওয়াটের আলো ওর মুখে পড়ছে। তবু ওর মুখটা পড়া যায় না।

'কারা?'

'এই তো মাস্তানেরা।'

'কবে?' আমি ঝড়ের মতো প্রশ্ন করতে থাকি।

‘চাইর তারিখ। আমরা এক সপ্তাহের এস্ট্রাইক করলাম। আইজগাই খুলছি আবার।’

‘কিছু হলো?’

‘এস্ট্রাইকের মইধ্যে আবার আইল। পিডাইল কয়জনরে এইহানে। তারপর জোর কইরা দোকান খোলাইল। মুরগি ভাইজা খাওয়াইতে হইল।’

সামনের টেবিলে দুইটা ছেলে সরু চোখে রশিদের কথা শুনছে। আমি আর সারিতা হতভম্ব হয়ে বসে। কী খাব আরেকবার আর রশিদ জিজ্ঞেস করল না। মাটির দিকে তাকিয়ে ও। খুব আস্তে আস্তে বলল—

‘আমাদের আর এইহানে থাকা সম্ভব না।’

তাই তো! এখানে তো আর থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু যাওয়াই বা সম্ভব কোথায়! আমরা রাখতে চাই না। আর পাকিস্তান নিতে চায় না। বিহারী ক্যাম্পের প্রাত্যহিক জীবন এত আটপৌরে হয়ে গেছে যে হয়তো আমার আর খেয়ালও পড়ে না। নাহলে গতমাসেই তো রশিদ দুজন মেয়ের ধর্ষণের খবর জানাল। সারিতা আর আমি ওখানে আর খেলাম না। খাবার প্যাকেট করে বাসায় নিয়ে এলাম সেই রাতে।

মৃত আলী বিহারী আবার ফিরে এল আমার মনে। এ দফা কম্বল ছাড়াই।

আলী বিহারী কেন অন্ধ সেই প্রশ্ন কখনো মাথায় এল না! দীর্ঘ কৃশকায় আলী বিহারীর লাঠিটা ওর প্রায় অর্ধেক সুফিয়া সামনে সামনে বয়ে নিয়ে যেত। সেভাবেই আমরা আলীকে শৈশব থেকে চিনতাম।...

নিশ্চয়ই অন্ধ আলী আর স্কুলের পিয়ন ছিল না। সেই পরিচয় তাহলে ওর আগে-থেকে-পাওয়া পরিচয়। তাহলে কী খেয়ে বাঁচত আলী বা সুফিয়া!...

পৌরসভার কলোনিতে থাকত। কিন্তু সেই কলোনি তো সেই কোন কালেই ভেঙে ফেলা হয়েছে! তাহলে ওরা থাকত কোথায়!...

আর আলী তো অন্ধ হলো স্বাধীনতার পর! ওর কোটরে চোখ ছিল না। আগে ছিল, উপড়ে ফেলা হয়েছে।...

আচ্ছা আলী কি কখনো পাকিস্তান যেতে চেয়েছিল? কিন্তু তা চাইবে কেন! পাকিস্তান থেকে তো সে এখানে আসেনি!...

আলী মারা গেছে সেই কবে! বাবাই বলছিল। সুফিয়াকে নিশ্চয়ই রিলিফের কম্বল দেয়া হয়। কিন্তু ওই বা কোথায়!...

এইসব আপাতঃ জ্ঞাত বিচ্ছিন্ন তথ্যগুলো জটিল এক ডিডাকশনে নিয়ে যেতে থাকে আমাকে। আমি আলীকে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি। মধ্যরাতে আমার আবার ঘুম ছুটে যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি ঘেমে নেয়ে হাঁসফাঁস করে উঠি। বুকের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে ফেলতে চাই। কিন্তু আমার গায়ে তো তখন তুলতুলে একটা কম্বল।

প্রতিটি রাত আমি তুলতুলে কম্বলের নিচে ঘুমাই। অথচ মধ্যরাতে ধড়মড় করে উঠি। মনে হয় একটা তক্তার নিচে চাপা পড়ে আছি। জগে রাখা পানি খেয়ে লালটা বদলে নীলটা টেনে গায়ে দিই। সেই একজোড়া গুলিস্তানের কম্বলের পর লাল টুকটুকে সার্টিনের কাপড়ের একটা লেপ হয়েছে আমার। বিদেশ যাবার সময় রুমা রেখে গেছে। ঘন নীল একটা কম্বল এসেছে তারও পরে। বাড়ি থেকে মা আমার জন্যই আলাদা করে একটা লেপ বানিয়ে পাঠিয়েছে। আমার এখন পাঁচখানা তুলতুলে লেপ কিংবা কম্বল। ষষ্ঠটা কিনে দেবে বলে আদূতা দু’ দু’ বার আমাকে নিয়ে বাজারে গেছে। কিন্তু লেপ-কম্বলগুলো আমাকে ত্রস্তই করে রেখেছে। এর একটাও আলীর কম্বলের বেষ্টণী থেকে আমাকে মুক্তি দেয় না।

সারাটা শীত ধরে আমি গ্রীষ্মের স্বপ্ন দেখতে থাকি। তারপর গ্রীষ্মের পর যখন প্রথম শীতে আমার লেপ-কম্বলের সংগ্রহে হাত দিই, দীর্ঘদেহী আলী আমার নৈমিত্তিক সঙ্গী হয়ে আছে। গোলকবিহীন তার অক্ষিকোটর আমাকে স্পষ্টভাবে এফোঁড় ওফোঁড় দেখে। আর আমি আগামী ভরন্ত শীতে সপ্তম কম্বল যোগাড়ের কথা ভাবি।

একেক বার আমার মনে হয়, হয়তো জামালের মা আমাকে উদ্ধার করতে পারবে। হয়তো ওর কাছ থেকে আলীর কম্বলটা আমার ফিরিয়ে নেয়াই কাজের হবে। হয়তো আলীর আমানত এখন এখানে থাকলে আমার আর হাঁসফাঁস লাগবে না। আমি জানি না। আমার মনে হয়। কিন্তু তা করতে হলে জামালের মাকে আমার তুলতুলে একটা কম্বল দিয়ে দিতে হবে। আর তা করতেও আমি এখন রাজি।

কিন্তু জামালের মা যে কোথায় তা তো আমি জানি না!

কুমড়া

ভালমনেই মিন্টু মিয়া কুমড়াটা নিয়ে বাজারে এসেছিল।

ঝুলে পড়া আর খুলতে থাকা খড়ের চালে কুমড়া কয়টা আতঙ্কিত হয়ে শুয়ে ছিল। মিন্টু মিয়া আর বউ বলে খ্যার। "কুমড়াগুলি না নামাইলি চাল তো ভেইঙ্গা যাবি। খ্যারের চাল তো চারবছর হইয়ি গেল। এ কি ছাদ পেইয়েছ?" এসব কথায় মিন্টু মিয়া কখনো হাসে। ও ভালই জানে খ্যারের চাল বলেই কুমড়াগুলো হয়েছে। ছাদে হতো না। সেটা বউ শেফালীও জানে। কথাগুলো আসলে চালের হাল নিয়ে বলা। মিন্টু গায়ে মাখে না। "বলারই তো কথা।" কোন ভালমানুষের বেটি চারবছর একই খ্যারের চালের নিচে থাকতে চায়? খ্যারগুলোর রঙ, মিন্টু ভাবে, কোনোকালে যে হলদেটে ছিল সেটা আর মনেও আসে না। পচা গোবরের মতো কালো হয়ে গেছে। আর ভুসভুসে। ভুলমনে কখনো কান খোঁচানোর জন্য মিন্টু একটা কালচে রঙের খ্যারের ল্যাজা ধরে টান দিলে আরো পাঁচ-দশটা সমেত গুঁড়া গুঁড়া হয়ে হাতে চলে আসে। সাধারণত মিন্টু লজ্জা পায়। একদিন কেন জানি রাগ চড়ে গেল। হাতের কাছে না-পাওয়া ঘরামিকেই এক হাত নিয়ে নিল। "সুমুন্দির পুত মতি যে কী চাল বানায়!" সেদিন আবার শেফালী হেসে ফেলেছিল। ফলে মিন্টু মিয়া সেই লজ্জাই আবার পায়। কমলা রঙের হয়ে-ওঠা কুমড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে ও। মিন্টুর খ্যারগুলোকে আরো পচা গোবরের মতো মনে হয়। কুমড়াগুলা সরানো দরকার। চালটা আরো খারাপ দেখায়।

সবসময় যে শেফালীর কথায় মিন্টু হাসে তা নয়। কখনো উপরের দাঁতের পাটি দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে ভুরু কুঁচকে মিন্টু কুমড়াগুলার দিকে তাকায়। একটু আলতো করে ডান হাত দিয়ে থুতনিটা চুলকাতে থাকে। যেন কুমড়া সৎকারের চাইতে আর কোনো জটিল দুরূহ কাজ জগতে মিন্টুর নেই। ওকে এই ভঙ্গিতে দেখে শেফালীর রাগ চড়ে যাবার কথা। কিন্তু শেফালীর হাসিই পায়। শেফালী ভাবে মিন্টু কুমড়াগুলো একসাথে পাড়বে। পেড়ে বলবে

পাড়ার ভাবিদের দিয়ে আসতে। এবারে কিন্তু মিন্টু কিছুতেই এত সহজ ফয়সালায় পৌঁছাতে পারে না। থুতনি টুতনি চুলকে ভুরু সোজা করে মাথা নামিয়ে আনে। যেন কুমড়া-টুমড়া কোনো প্রসঙ্গ নয়। এরকমই চলছিল।

তারপর সেদিন সকালে হঠাৎ ঘুম থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ে মিন্টু মিয়া। আধঘুমো শেফালীর মনে হলো বুঝি স্বপ্ন দেখে ওইরকম করছে। সে ডেকেও বসল "যাও কই।" মিন্টু মিয়া এমন দৃঢ় গলায় "আইসছি দাঁড়াও" বলে বাইরে গেল যে শেফালীর আর চিন্তা থাকল না। দু' বছরের মেয়েটা বাবার এই দুড়দাড় করে যাওয়াতে একবার ভ্যা করে কান্না শুরু করল, তারপর ভুলে গিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। শেফালীও তখন করবার মত কিছু কাজ নেই জেনে আরেক প্রস্থ ঘুমানোর জন্য মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে পাশ ফিরল। মিন্টু ততক্ষণে পাশের বড়ই গাছটাতে চড়ে লুঙ্গি সামলে ঠ্যাং লম্বা করে চালে নেমেছে। কিছু ঢ্যাবসা খড় শেফালীর শাড়ির ওপরে পড়ল। ও তেমন খেয়াল না করেই ঘুমাতে থাকে।

মিন্টু পান্তা খেল বউয়ের সঙ্গেই। অনেক ছিল না। যতটুকু ছিল সেটা নিজেই সমান ভাগ করে খুশি খুশি মনে শেফালীকে ডাকতে লাগল। শেফালীর তখন রাগে মুখটা লাল হয়ে আছে। এই চালে বারবার ওঠার কী মানে! শেফালীর সাফ সাফ জিজ্ঞাসা।

'এমন লাফ দিয়ি উঠলা য্যান স্বপ্নে দেইখিছো। কুমড়া পাড়বা ভাল কথা। তো একটা কুমড়া পারতি গেলা ক্যানে?'

'বাজারে নিয়ি যাব।' হাতের তেলো চাটতে চাটতে মিন্টু বলে।

'বুঝলাম তো বাজারে নিয়ি যাবা। তো সবগুলা বাজারে নিয়া যেতু না?'

'বললাম না একটা একটা কইরি নিয়ি যাব।'

মিন্টু এ বিষয়ে বিশেষ আলাপ করবে না—এটা শেফালী খুব ভাল করে জানে। বিয়ের পর থেকে এই লোকটার কার্যকারখানা দেখতে দেখতে শেফালীর বহু শিক্ষা হয়ে গেছে। তাও যদ্দিন শাশুড়ি ছিল একটু অন্যরকমই লাগত মিন্টুকে। শেফালীর নিশ্চিত মনে হয় শাশুড়ি মরে যাওয়াতে লোকটা আরো পাগলা পাগলা হয়ে গেছে। দুই জায়ের সঙ্গে যখন শেফালী কথা বলে তখন সে মিন্টুকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করে। কিন্তু একা একা দেখতে থাকলে ওর আসলেই রাগ ওঠে। যদিও একটু পরই ওর কোনো না কোনো কারণে হেসে ফেলা লাগে। সেই জায়েরা এই এক ঘরে গায়ে গায়ে লেগে ছিল। এখন তারা স্বামীদের সঙ্গে চলে গেছে। দুই ভাসুরই রিকশা চালায়। বড়জন মোহিনী মিলে, মানে শাহ মখদুম মিলে কাজ করতে গেছিল। শেষে কুষ্টিয়াতে রিকশা চালায়। পরে মেজোজন বড়ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে রিকশা চালাতেই চলে গিয়েছিল কুষ্টিয়া। এখন আবার ঝিনাইদহে তার শ্বশুরবাড়ির ধারে রিকশা চালায়। মিন্টু রিকশা চালাবে না। সে ভিটাও ছাড়বে না। ফলে কামলা খাটাই তার কাজ। তাও যখন পায়। আগের দিনই সাধারণত কেউ না কেউ এসে বায়না করে। না করলে পরদিন কাজ নাই। ছোটবাজারের মোড়ে ভোরবেলা ঝুড়ি কোদাল নিয়ে বসতে এখনো মিন্টু চায় না। সে নিয়ে শেফালীরও কোনো আক্ষেপ নাই। কামলা বিক্রি করেই তো খাওয়া। শেফালী ভাবে আল্লা যদি কোনোদিন রাস্তার পাশেও বসায়, তো বসবে।

নতুন লোকে নাম জিজ্ঞেস করলে "মিন্টু আমার নাম" বলে এমন এক হাসি দেয় মিন্টু যে শেফালীর পিত্তি জ্বলে যায়। সেই কবে এক সিনেমা দেখেছিল মিন্টু। তার নাম ছিল "মিন্টু আমার নাম"। তারপর থেকে সে এইভাবে লোকজনকে নাম বলে। খবরটা বিয়ের পর শেফালীর শাশুড়ি দিয়েছে। এমনকি লোকে নাম জিজ্ঞেস না করলেও সে একা একা হঠাৎ করে "মিন্টু আমার নাম" বলে বসে। শেফালীর বিয়ের পর দুইবার তাকে নিয়েও সিনেমা দেখতে গিয়েছিল মিন্টু। এখন আর যায় না। শেফালী বুঝতে পারে মিন্টুর অবস্থা আসলে পড়তির দিকে। যদিও তখনো কামলাই ছিল মিন্টু। এই তো তিন বছর আগেকারই তো কথা! অবশ্য সিনেমা দেখা নিয়েও শেফালীর কোনো আফসোস নেই।

যাহোক শেফালী বুঝতে পারে মিন্টুর মাথায় নতুন ফন্দি এসেছে। কাজ পায় না যখন, বাসাতেই ঝিম মারে। এখন এই একটা একটা করে কুমড়া সে বাজারে নিয়ে যাবে। একমাত্র জামাটাকে এত সময় ধরে মিন্টু পরে যেন শেরওয়ানী গায়ে দিচ্ছে। তারপর ডান হাতে কুমড়ার বোঁটাটা শক্ত করে ধরে, বাঁ হাতে লুঙ্গির একটা কোণা তুলে ধরে, একগাল হাসি দিয়ে মিন্টু বউয়ের কাছে বিদায় নিয়ে রওনা হয়। মিন্টুকে খুশি দেখে শেফালীর আসলে ভালই লাগে শেষমেশ।

কুমড়াটা নিয়ে মিন্টু মিয়া ভালমনেই বাজারে এসেছিল। অনেকক্ষণ বসেও ছিল তেমন কোনো বিপর্যয় ছাড়া।

বেলা ঠিক দশটার দিকে মিন্টু মিয়া ছাল-ওঠা আর একপাশে টেঁপশে যাওয়া হাবিলদারের জুতোজোড়া দেখতে পায়। হাঁটছে। বাজারের শেষ প্রান্ত দিয়ে পৌরসভা পুকুরের দিকে পায়ে হাঁটার যে রাস্তা, মিন্টু বসে ছিল সেই রাস্তার ধারেই। লোকজন এমনিতে যে মিন্টু বিশেষ অপছন্দ করে তা নয়। কিন্তু কুমড়াটা নিয়ে ও একটু দুরে দুরে থাকতেই চাচ্ছিল। হাবিলদারের জুতোজোড়া দেখে সে বগলের দিকে তাকায়। হাবিলদারের বগলে বরাবরের মতোই লাঠিখানা। তখনো মিন্টু ঠিক ভাবেনি যে হাবিলদার এই কুমড়া দেখতে আসছে। মিন্টু একেবারে অভ্যাসবশে আড়চোখে হাবিলদারের জুতা, তারপর বগলের লাঠি, তারপর হাবিলদারের মুখ আর মোঁচ দেখে। হাবিলদার ততক্ষণে একদম কুমড়ার পাশে দাঁড়িয়ে।

'কী রে একখান কুমড়ো নিয়ি বইসে রইয়িচিস!' হাবিলদার তাকে উসকায়।

'হ্যাঁ। পাঁচ টাকা।'

মিন্টুও একদম তলানিতে চলে আসে। অন্য কাউকেই সে পাঁচ টাকা বলতে রাজি ছিল না। অন্যদিকে তাকিয়ে সে বলে।

'এই কুমড়ো পাঁচ টাকা? হুঁহ্!' খ্যাঁকানি দেয় হাবিলদার। মিন্টুও আর কথা বলতে রাজি হয় না।

এরই মধ্যে হাবিলদার হাঁটু ভেঙে বসে পড়েছে। আর মিন্টু কিছু বোঝার আগেই কুমড়াতে একটা চিমটি বসিয়ে দিয়েছে। মিন্টু হতভম্ব হয়ে পড়ে। একটু আগে সে রহিম পেশকারকে হাতই দিতে দেয়নি কুমড়াতে।

'এইটি কি লাউ নাকি?'

'লাউ হোলিই তুই চিমটি কাটতে দিইতিস?'

মিন্টুর মুখে আর উত্তর আসে না। সে বলে—

'ভাল কুমড়া।'

'হ্যাঁ সে তো দেইখতিই পাচ্চি। দিয়ে দে।'

'কী বলেন ছার?'

এতক্ষণ যে আশঙ্কা করছিল তার দ্বারপ্রান্তে হাবিলদার পৌঁছে গেছে দেখে মিন্টু মরিয়া হয়ে ওঠে।

'পয়সা দিবেন না?' নাচার হয়ে বলে বসে মিন্টু।

'হ্যাঁ রে! তোর বাপের জায়গায় বইসিচিস?'

হাবিলদার মেলা কথা খরচ করার কারণ দেখে না। মিন্টু কথাটা শুনে দমে যায় না। ওর ইচ্ছে করে হাবিলদারের বগল থেকে লাঠিটা সুরুত করে বের করে কিছু একটা করে বসে। কিন্তু সেটা যে খুব অবিবেচকের মত হয়ে যাবে তা নিশ্চিত জানে সে। লাঠির দিকেই সে তাকিয়ে থাকে। একটা যুৎসই উত্তর খুঁজে পায়—

'আপনারাই তো মা-বাপ। আপনাদের জায়গাতিই তো বইসিচি।'

এইবারে যে কাজটা মিন্টু করতে চায় নাই, সেই কাজটাই করে বসল হাবিলদার। বাম বগলের তলা থেকে ডান হাত দিয়ে লাঠিটা বের করে মিন্টুর পাছা পেঁচিয়ে একটা বাড়ি দিল। মিন্টু ছিল বসে। ফলে বাড়িটা গিয়ে পড়ে কোমরে। মিন্টু ত্বরিৎ কুমড়াটা বগলদাবা করে নেয়। দ্বিতীয় বাড়িটা তুলতে তুলতে হাবিলদার বলে "জানিস না শুইয়োরের বাচ্চা, আমি দারোগার বাজার করি?" আর মিন্টু কুমড়া বগলদাবা অবস্থায় "ওরে বাবারে, মাগো রে ..." বলে চেঁচামেচি করতে করতেই দ্বিতীয় বাড়ি খায় হাঁটুর দিকে। এবং এটা আরো জোরে। এরপরই সে পৌরসভার পুকুরের দিকে একটা দৌড় লাগাতে শুরু করে। হাবিলদারও ভালমতো উঠে দাঁড়িয়ে ওকে ধাওয়া দেয়।

তিন কি চার লাফও মিন্টু দৌড়াতে পারেনি। আশপাশের সব তরিতরকারি বিক্রেতা এবং ক্রেতা, টিনের চালার নিচে গরু-মহিষের জবাইওয়ালা বিক্রেতা সবাই এই দৃশ্য তখন দেখছে। কাজ-বাজ সব হাতে ফেলে রেখে সকলের ঘাড়, মাথা, চোখ তখন এদিকে। এদের সবাইকে মিন্টু গভীর হতাশায় ফেলে দিয়ে পা পিছলে গিয়ে পড়ল ড্রেনের মধ্যে। পৌরসভার ড্রেন, ফলে হেন জিনিস নাই যে এর মধ্যে বহমান না। শক্ত ইট থেকে শুরু করে নরম সব। আবার বেশ গভীরও। তার মধ্যে মিন্টু "আঁক" ধরনের একটা শব্দ করে পড়ল। হতে পারে কোমরের ব্যথাটার কারণেই ও ঠিকমতো দৌড়াতে পারছিল না। আবার হতে পারে যে পেছনে হাবিলদার দৌড়াচ্ছিল বলেই ও থতমত খেয়ে পা ফেলতে পারেনি ঠিকমতো। যাহোক, মিন্টু পড়ল। আর কুমড়াটা কী এক কারণে ড্রেনের বাইরে পড়েছে। আর আপাতঃ এই ছন্দোপতনে হাবিলদার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল খানিক। বিশেষতঃ এদিক-সেদিক থেকে ক্রেতা-বিক্রেতারা কেউ কেউ দৌড়ে আসতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেন্ডেই হাবিলদার বুঝল ওরা মিন্টুকে তুলতে আসছে। খানিক প্রশান্তিতে হাবিলদার কুমড়াটা মাটি থেকে তুলে বার দুয়েক ফুঁ দিল। একটা আধা ধরনের গালি দিল। দিল মিন্টুকেই। সম্ভবত আছাড় খেয়ে তার তাড়া দেয়াটাকে মাটি করে দিল বলে। কিন্তু শুনলে মনে হয় গালি দিল কুমড়াটাকে। তবে সত্যি তাকে তখন খুশি খুশি দেখাচ্ছিল। সে তেমন কোনো নতুন আওয়াজ না করে কুমড়াটা নিয়ে আগের দোকানে রাখা তার ব্যাগের সন্ধানে চলে গেল।

মোটামুটি এগারোটা নাগাদই মিন্টুকে হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। যারা ওকে নিয়ে এসেছিল তারাই দেখতে থাকল। এবং সেটাও বিশেষ এই দ্বিধা সমেত যে এই পুরো ঘটনাটিকে কৌতুকের হিসেবে দেখা আদৌ ঠিক হবে কিনা। তার মধ্যে দোকান ফেলে এসেছে সবাই। ফলে সবাই চলে গেল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। হাসপাতাল পৌরসভার পুকুরের একেবারে ধারেই। ওদিকের রাস্তাটা আলাদা এই যা। ফলে মিন্টুর পতনস্থল এবং তার গুণাগুণ বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল উদ্ধারকর্মীদের। তারা সবাই মিলে প্রায় ফুট চারেক নিচ থেকে স্তম্ভিত এবং ক্লিষ্ট মিন্টুকে তোলে। মিন্টুর জামায়, গায়ে সর্বত্র তখন যথা-অসম্ভব মাখামাখি। লোকজন বুঝে পেল না হাত দেবে কোথায়। আর পায়ে বিঘত খানেক জায়গা কালো ঝোল আর রক্তে ভয়ানক দেখাচ্ছে। লোকজন যখন হেঁচড়ে ডাঙায় তুলল তখন একবার ঘোলাটে চোখে চারপাশ দেখে নিল মিন্টু। কুমড়াটার খোঁজেই সম্ভবত। তারপর সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় একবার "উফ্" বলে চোখ বুঁজল। লোকজনের কাজ অবশ্য অত সহজে শেষ হলো না। প্রথমেই তারা চ্যাংদোলা করে মিন্টুকে নিয়ে পৌরসভার পুকুরের ঘাটে নিয়ে গেল। বাস্তবে প্রায় গোসল সারাল তারা ওর। এবং নিজেদের শরীরও ফেলল সব ভিজিয়ে। পায়ের বিঘত খানেক চামড়া-ছোলা জায়গায় পানি লাগতেই মিন্টু আরেকবার "উফ্" বলল। কিন্তু লোকে ঠিকই বুঝল আসল ব্যথা কোমরে আর পিঠে।

লোকজন যতই "মাজা ভেইঙেছে" বলুক না কেন এক্স-রে করে হাসপাতালের লোকজন বলে দিল ভাঙেনি। বাজারের এতগুলো লোককে ভাগানোর জন্যই তারা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এক্স-রে টেক্স-রে করে মিন্টুকে শুইয়ে দিল। বলল—

'বাড়িত খবর দাও গিয়ি। আর যাও তো সবাই। এক রুগির জইন্য বাজারসুদ্দু লোক চইলি এয়সিছে।'

লোকজন অনেকেই যাবার আগে মিন্টুকে ধরে ভরসা দিয়ে গেল। একজন পাড়ার ছেলেও পাওয়া গেল। সে নিজেই মিন্টুর বাড়িতে গিয়ে খবর দেবে বলল। সব মিলে একটা হুলুস্থুল যখন শেষ তখনই কেবল মিন্টু পুরো বিষয়টা নিয়ে একটু বিষণ্ন হবার সুযোগ পেয়েছে।

মিন্টু একটু বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। হাঁটুর নিচের ক্ষতে আয়োডিন লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল আগেই। খালি পেটেই খান তিনেক বড়িও নার্সরা গিলিয়ে দিয়েছে। খেয়েছে কিনা ওকে জিজ্ঞেস করেছিল। ও বলে দেয় যে খেয়েছে। সকালের পান্তাটার কথাই সে বোঝাতে চেয়েছে। এরপর ওর পাছা উদোম করে যেখানটাতে হাবিলদার

মারটা ঠিকমত লাগাতে পারেনি, ওইখানে একটা ইঞ্জেকশন ফুটিয়ে দিল। বেলা সাড়ে বারোটার দিকে খালি গায়ের ছিলে যাওয়া জায়গাগুলোতে একটু হাতের ছোঁয়া পেয়ে মিন্টু জেগে ওঠে।

সিভিল সার্জনকে লোকজন রাণা ডাক্তার হিসেবে চেনে। তাঁর নাম রাণা আহমেদ। এবং তিনি এরকম বানানেই কালো টিনের ওপর হলুদ রঙে তাঁর নামটা বাঁশ দিয়ে খাড়া করে রেখেছেন। হাসপাতালে ঢোকার সদর দরজার ঠিক পাশেই। প্রতি দুপুরে সরকারী বাসভবনে খেতে যান। তার আগে আধাঘণ্টা সময় তিনি জেনারেল ওয়ার্ডে ঘোরেন। এই রুটিনটা তিনিই চালু করেছেন হাসপাতালে। প্রতিদিনকার মতো তিনি কাজটা সেরেই চলে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চোখ খুলেই মিন্টু এমন হাউ হাউ করে সকালের যাবতীয় ঘটনা বলতে শুরু করে যে রাণা ডাক্তার ঠিক চলে যেতে পারছিলেন না। অন্য সময় হলে তিনি বলতেন "হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। তুমি বিশ্রাম নাও। ঠিক হয়ে যাবে।" ইত্যাদি। মিন্টুর বলার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যে ডাক্তার সাহেব মনোযোগ দিলেন। শুনলেন। এবং মিন্টুর প্রায় কাদা-মাখা চুলেও একটু হাত দিয়ে দেখলেন।

বেলা আড়াইটার সময় দেখা গেল শেফালী হাসপাতালের বারান্দায় বসে আছে। ভীষণ ভারী গম্ভীর একটা মুখ ওর। ভেতরে হাসপাতালের বিছানায় মিন্টু আরেক দফা ঘুমাচ্ছে। দারোগা হোন্ডাটা থামিয়ে বাইরের গেটের দিকে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। শেফালী ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। কী চিন্তা করে একজন নার্সের সঙ্গে কথা বলবার জন্য ভিতরে ঢুকেছে। তার নিশ্চিত বিশ্বাস দারোগা এবারে মিন্টুকে থানায় নিয়ে যেতে এসেছে। মিনিট কয়েক খামকাই শেফালী ওয়ার্ডের ভেতরে দৌড়াদৌড়ি করল। দারোগা সিগারেটটা আধখাওয়া অবস্থাতেই দেখল হাবিলদার সাইকেল নিয়ে ঢুকেছে। সিগারেটের পাছা মাটিতে ফেলে যখন জুতা দিয়ে পাড়াচ্ছে দারোগা, হাবিলদারের মুখটা শুকিয়ে কাঠ। সাইকেল থেকে নেমে স্যালুট ঠুকতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে একশেষ। দারোগা সেই স্যালুট পাত্তাও দিল না। এমনভাবে ওয়ার্ডের ভেতরে ঢুকল যে হাবিলদারও বুঝে গেল যে কী করতে হবে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দারোগা বুঝে নিল কোন বিছানা। তারপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শেফালীর দিকে একবার তাকিয়ে ঘুমন্ত মিন্টুর মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল—

'কী হয়েছে রে?'

ধড়মড় করে উঠে বসে মিন্টু। শেফালী কিছু একটা বলতে যায়। দারোগা তাকে থামিয়ে দেয়। দারোগার পেছন থেকে ইঁদুরের মতো উঁকি দিয়ে তাকিয়ে থাকে হাবিলদার।

রাণা ডাক্তারের মন যারপরনাই তেতো হয়ে গিয়েছিল। এসব আকছার দেখছেন তিনি। কিন্তু আজ কেন জানি তাঁর মনে ধরেছে। দুপুরে খেতে বসেও তাঁর স্বাদ ফিরছিল না। এঁটো হাতেই তিনি ফোন করে বসলেন এসপি সাহেবকে। সকালের ঘটনাটা নিয়ে কথা বললেন। এসপি সাহেব তখন বাসায় গড়াগড়ি করছেন ভাত খেয়ে। প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন তিনি—"হঠাৎ এসব নিয়ে মাতলেন কেন ডাক্তারসাহেব?" কিন্তু পরে রাণা ডাক্তারের কটাক্ষগুলো তাঁর লেগেছে। এমনিতেই গত তিনরাতে ডাক্তার সাহেবের কাছে তাসে গাড্ডা মারছেন তিনি। শেষে গলায় অবশ্য বন্ধুত্বটা ধরে রাখলেন—"ডাক্তারসাহেব, আমি দেখছি। তবে এসব বিষয় অহেতুক পাত্তা দিচ্ছেন কিন্তু।" এসপি সাহেবের 'দেখছি'টা রাণা ডাক্তারের মোটামুটি শান্তিতে খাবার একটা ব্যবস্থা করল। ফোনটা রেখেই প্রায় বাঘের মতো লাফ দিয়ে এসপি সাহেব চাপরাশিকে ডাকতে ছোটেন বারান্দায়। ওসি মানে দারোগা তখনও ঠিকমতো খায়নি। এসপির তলব শুনেই বিষম খেয়ে বসল। মাথায় স্ত্রী থাবড়া দিতে এলে হাত সরিয়ে দিয়ে বেল্ট বাঁধতে লেগে গেল দারোগা। এসপি কিন্তু দারোগাকে হাসপাতালে যেতে বলেননি। কিন্তু তাঁর বাসা থেকে গালাগাল শুনে এসে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে দারোগার। থানার অফিস ঘরে মতি হাবিলদারকে দেখেই বলল—"একটা বালও তো ঠিকমতো ছিঁড়তে পার না। হাসপাতালে চলো।" মতি হাবিলদারের বোঝার কারণ ছিল না হাসপাতালে যেতে হবে কেন। সারা সপ্তাহে এরকম ঘটনা কতগুলো ঘটে তার কোনো হিসাব

আছে? কিন্তু তার মাথা খুব ভাল কাজ করছিল সেদিন। সে বেড়ালের মতো মুখ করে সাইকেলটা বের করতে গেল। তারপর এই কাহিনী।

ধড়মড় করে উঠে বসে মিন্টু হাউ হাউ করে তাই-ই বলল যা রাণা ডাক্তারকে বলেছিল। এক অপার্থিব রহস্যজনক কারণে দারোগা এই প্রথমবারের মতো মনোযোগ দিয়ে কারো কথা শুনল। শেফালী কাঁদবে নাকি দারোগাকে দুই কথা শুনিয়ে দেবে এই নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে। দারোগা হাসপাতালে চলে এসেছে রাগের চোটে। তার ইচ্ছা ছিল মতিকেও আচ্ছামতো গালাগালি করবে আর কুমড়াওয়ালাকে ভয়টয় দেখিয়ে আসবে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে যেন থানায় যায়। কিন্তু মিন্টুর এই দীর্ঘ বয়ানে সব আউলিয়ে গেল। আসাটা, সে বুঝল, ঠিক হয়নি। কী নিয়ে একটা বিচার-মতো কিছু করা যায় তাই ভাবতে থাকে দারোগা। শেষে উপসংহারে যেন কুমড়াটাই সকল নষ্টের মূলে, দারোগা জিজ্ঞেস করে –

'তো সেই কুমড়ো কই?'

'ছার, কুমড়ো তো আপনার জন্যিই নিয়ি গিয়িলো। বললাম না?' মিন্টু বলে।

'ছার, কুমড়ো তো ড্রেইনি পইড়ি গেল। বললাম না?' হাবিলদার বলে।

'না ছার, ড্রেইনি পড়েনিকো। ছার ড্রেইনি পইড়িছি আমি।' আবারো মিন্টু।

'ছার দুজনেই ড্রেইনি পইড়ি যাচ্চিলো। আমি ধইরিচি। কুমড়োটা।' আবারো হাবিলদার। দারোগা হাঁসফাঁশ করতে থাকে।

'তো কই সেটা মতি?' দারোগা ধমক দেয়।

'আছে তো!' ধমক খেয়ে হাবিলদার মিউমিউ করতে থাকে।

'সেটা নিয়ে আমার অফিসে আয়।' বলে দারোগা শেফালীর দিকে তাকিয়ে আন্তরিকভাবে বলল—

'ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া দিও।'

একটা ভাল বিচারকার্য শেষ করবার খুশিতে দারোগা রওনা দিল দরোজার দিকে। মতিকে শায়েস্তা অফিসেই করবে। হাবিলদার ক্যাবলা মুখে দরোজা পর্যন্ত গেল, তারপর দারোগা মোটরসাইকেল স্টার্ট দেবার পর আবার বোঁ করে ঘুরে মিন্টুর বিছানার দিকেই দৌড়ে আসল। মিন্টু আর শেফালী সেদিকেই তাকিয়ে ছিল। শুয়ে থাকা অন্য রোগী আর তাদের আত্মীয়রাও এসবই দেখছে। এক দৌড়ে হাবিলদার মিন্টুর মাথার উপর ঝুঁকে চোখ গোলগোল করে তাকায়।

'তোর নাম কী রে?'

'মিন্টু আমার নাম।'

'তোর কি মাথা খারাপ হইয়েছে?'

'ক্যানে?'

'কুমড়োটা ড্রেইনি পইড়লি কী হোতু? আমি এখন কুমড়ো কোথায় পাব?'

'ক্যানে?'

'কুমড়ো তো তোর ভাবিকে দিয়ি এইসিচি।'

চারটার দিকে হাবিলদার যখন দারোগার ঘরে কুমড়ো নিয়ে ঢোকে তখন দারোগা অনেক ঠাÊা। দুপুরের এসপির অপমান আর তখন মাথায় নেই। ভালমতো না তাকিয়েই বলে "যা তোর ভাবিকে দিয়ে আয়।" আর মিন্টু তখন হাসপাতালে চোখ বুঁজে আছে। হাসিমাখা একটা মুখ তখন। দ্বিতীয় কুমড়াটার ভাল একটা ব্যবস্থা হয়েছে। আর শেফালী রিকশায় বাড়ি গেল। হাবিলদারের পয়সায়। মতি হাবিলদার তখন পচা চালে কুমড়া কীভাবে পাড়বে তাই নিয়ে ভয় পাচ্ছিল। মিন্টুই তাকে মইয়ের বুদ্ধি দিয়ে পাঠাল।

সেই দুপুরটা অশান্তিতে কাটল কেবল এসপি সাহেবের। রাগে তাঁর মাথা গরম হয়ে গেল। বাথরুমে গিয়ে মাথায় পানি ঢাললেন তিনি। তারপর তিনি ফোন ঘুরিয়ে ডাক্তার সাহেবের অফিসে একটা ফোন দিলেন।

'কী ডাক্তার সাহেব দেখলেন তো?' কথাটা বলবার সময় এসপি সাহেব গলা লুকাতে পারলেন না।

‘কী দেখালেন?’ রাণা ডাক্তার প্রায় ভুলতেই বসেছিলেন। এসপির ফোনে তাঁরও মেজাজ ফিরে এল।

‘পুলিশ ডিপার্টমেন্ট মরে যায়নি, বুঝলেন?’

‘সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কীভাবে বেঁচে উঠল সেটাও বলুন প্লিজ।’

হাসতে হাসতেই ডাক্তার পেরেক পুঁততে থাকলেন। এসপি সাহেব আবারো কুঁকরে গেলেন। কারণ আসলেও তিনি বিশেষ কোনো ফলো-আপ জানেন না। ফলে তিনি আবারো কোনোমতে ফোনটা রেখে ফোনের উপরই লাফ দিয়ে পড়লেন।

‘ওসি সাহেব। সেই কেইসের কী হলো?’

‘কোন কেস স্যার?’ দারোগা ভাবতেই পারে না সকালের ঘটনাটা কেইস হয়ে গেছে।

‘কেইস না, মানে কুমড়ো।’

দারোগা আশ্চর্য হয়ে যায়। এসপির হলোটা কী আজ? এসপিও নিজের এলোমেলো আচরণে ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়েন।

‘হ্যাঁ, না মানে মতিকে আচ্ছামতো শান্টিং দিয়েছেন তো?’

‘ও মতি স্যার?’

‘হ্যাঁ শান্টিং! দিয়েছেন তো?’

‘সে তো স্যার কেঁদে-টেদে একাকার।’

মতি একটু ঝিমাচ্ছিল। দারোগার কথা কানে আসতেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

‘হ্যাঁ, ওই ডাক্তার সাহেব সকালে বলছিলেন কুমড়োটা নাকি আপনার জন্যই এনেছে মতি।’

‘স্যার এইটা আপনি বিশ্বাস করলেন?’

‘ওসি সাহেব, আমি আপনার নোটিসে আনলাম।’

‘স্যার আমি মতিকে আবার ডাকছি।’

‘না না ছেড়ে দিন। বেচারার এক কুমড়ো নিয়ে কম ভোগান্তি হলো না।’

‘স্যার আপনার কথা ভেবেই আমি ওকে আজ ছেড়ে দিয়েছি।’

‘তো...এখন কোথায়?’

‘এই তো অফিসেই আছে স্যার।’

‘তো নিয়ে আসুন না।’

‘স্যার, বেশি লাই হয়ে যাবে না? আপনি এর মধ্যে আবার...’

‘আহা হা, মতির কথা কে বলছে?’

‘ও ... তাহলে?’

‘কুমড়োটা। আসলে বাজারে পাঠাবার সময় এই কুমড়ো টুমড়ো আর মনে পড়ে না। অথচ রুটি দিয়ে ঘ্যাট খেতে...আপনি তো জানেন, আমি তো রাতে রুটি খাওয়া অভ্যাস করেছি।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার ... হাতের কাজটা সেরেই আসছি স্যার।’

এরপর দারোগাকে নিজের কোয়ার্টারে একদৌড়ে যেতে দেখা গেল, এবং একই গতিতে অফিসেও আসতে দেখা গেল। মতি পুরো সময়টা গোলগোল চোখে তাকিয়েই থাকল।

‘কেটে ফেলেছে মতি।’

‘কেইটে ফেলিচে ছার?’

‘একটুখানি ফালি করে ফেলে কাজের মেয়েকে দিয়ে দিয়েছে।’

‘কটুক কেইটেচে?’

‘কটুক দিয়ে কী করবি?’

দারোগা হতাশ হয়ে ধমকানো শুরু করল।

‘ছার কুমড়োটা না কুফা!’ মতি দার্শনিকভাবে বলল।

‘এখন কুমড়ো পাই কই?’

‘ছার ওইদির বাড়িতে আরু আচে।’

‘শিগগির চল। হাতের কাজ সেরে আসব বলেছি।’

‘ছার, হাসপাতালে কুমড়োআলার পারমিশান নেয়া ভাল। ঝামেলা বাধাইতি পারে।’

মতির মাথা খুলে গেছে। চোখ বুঁজে গম্ভীরভাবে সে বসকে পরামর্শ দেয়। তারপর হাসিমুখে দারোগার পেছনে মোটরসাইকেলে চাপে।

সাড়ে চারটার মধ্যেই তিন নম্বর কুমড়াটার ব্যবস্থা করে মিন্টুর তখন মন টইটম্বুর। সকালেও সে এরকম ভাবেনি। সে একটা একটা কুমড়া বাজারে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এখন পিঠে, পাছায়, পায়ে ভীষণ

ব্যথা নিয়ে মিন্টু শুয়ে। কিন্তু এক প্রগাঢ় দার্শনিক প্রসন্নতা তার চেহারায় জেল্লা এনেছে। মিন্টু বিশ্বাস করতে শুরু করে ঘটনা-পরম্পরা ভালই হয়েছে।

কুমড়া বিষয়ে ভাল একটা ফয়সালা করে এসপি সাহেব মাথায় হাত দিয়ে দেখলেন তেমন গরম নেই। তিনি ক্রীড়াবিদ পোশাক পরতে থাকলেন খুবই খুশি মনে। কিন্তু যেই না টেনিস কোর্টের পাশে গাড়িটা পার্ক করেছেন ডিসি সাহেবকে দেখে তাঁর দুপুরের অপমানটা আবার মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল। নেমেই সম্ভাষণ করলেন প্রথমে ডিসি সাহেবকে, তারপর অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটকে। তারপরই আর না বলে পারলেন না "আচ্ছা ডিসি সাহেব, আমাদের ডিলিং-এর মধ্যে রাণাসাহেব এসব ছোটখাট ইস্যু এনে কাজটা ভাল করলেন?" এসপি আসলেই দুপুর থেকে টেঁশে আছেন। তা না হলে তাঁর ধরে নেবার কোনো কারণ নেই যে ডিসিও ঘটনাটি জানেন। কার্যতঃ ডিসি সাহেব ফ্যালফ্যাল করেই তাকিয়ে থাকলেন। ম্যাজিস্ট্রেটরাও বটে। ঘটনাটা শূন্য থেকে বলতে গিয়ে বাস্তবিকই এসপি সাহেব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

ডিসি সাহেব ক্রীড়ারসিক মানুষ। সরকারী অফিসারদের টেনিস খেলবার জায়গাটাকে তিনি নিজের মনের মতো করে সাজিয়েছেন। সামনে-পেছনে বল ঠেকাতে লোহার গ্রিল দেয়ার জন্য যা পয়সা ছিল তাতে পনেরো ফুট উঁচু করে গ্রিল দেয়া যেত। ডিসি সাহেব অধস্তন সহকর্মীদের সুবিধের কথা ভেবে এদিক-ওদিক থেকে টাকা যোগাড় করে পঁচিশ ফুট উঁচু করে গ্রিল দিয়ে দিয়েছিলেন। তাতেও বল পাশের বাড়িতে চলে যাচ্ছিল। অধিকাংশ সময়েই বল-বয়দেরকেই খেলোয়াড় মনে হতো, খেলোয়াড় অফিসারদেরই বরং দর্শক মনে হতো। দুইজন বল-বয় দিয়ে আর কুলাচ্ছিল না। এসপি সাহেব এসে এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের আগে ডিসি সাহেব সহ-খেলোয়াড়দের, মানে সহকর্মীদের, সঙ্গে শলাপরামর্শ করছিলেন পুরোটা গ্রিলের একটা ছাদ বানিয়ে দিলে কেমন হয়। তিনি যুক্তি দিচ্ছিলেন, দেখতে একটু খারাপ দেখালেও বল দুরে যাবে না। এবং প্লেয়ারেরা এ্যাকচুয়েলি বেশিক্ষণ খেলতে পারবেন। এরই মধ্যে এই এসপি। বন্ধুত্ব-বিপর্যয়ের আশু আশঙ্কায় ডিসি সাহেব টেনিস কমপ্লেক্সের ফোনে তাড়াতাড়ি ফোন করতে লাগলেন।

হাফপ্যান্ট পরে হারুন ডাক্তারের মোটর সাইকেলের পেছনে উঠবার সময় কী মনে করে রাণা ডাক্তার জেনারেল ওয়ার্ডে একবার মিন্টুকে দেখতে গেলেন। মিন্টু বেশ ক্লান্ত তখন, তবু প্রসন্নতা তখনো পুরো কাটেনি। শুধু ওষুধ আর ইঞ্জেকশনে ওর খিদে পেয়েছে। কোমরে, পায়ে ব্যথা টনটন। ডাক্তারকে আবার আসতে দেখে ও ভাবে খিদের কথাটা বলবে। ডাক্তারই বলেন প্রথম কথা—

'কী? কেমন?'

'হ্যাঁ, ছার।'

'তোমার জন্য কথা বলতে গিয়ে কী অবস্থা জানো? এখন সালিশ বসছে।'

'কোথায় ছার?'

সালিশের কথা শুনে মিন্টু তড়াক করে বসতে গেল।

'আহা তোমার সালিশ না।'

'ছার আমি তো বাদী।" মিন্টু বলে।

'স্যার, সালিশ শব্দটা ব্যবহার করে ঠিক করেননি বোধহয়।' এবারে হারুন ডাক্তার বলে।

'ছার আমি তো বাদী।' মিন্টু আবার বলে।

'না না সে সালিশ নয়। এটা হলো গে আমার সালিশ। আমার সালিশ বসবে।' রাণা ডাক্তার পরিত্রাণ খোঁজেন।

'তাইলেও ছার আমি যাব। আপনাকে নিয়ি সালিশ বইসবে...আমি যাব না?'

নিজের কৃতকর্মের জের হিসেবে এরপর রাণা ডাক্তার ড্রাইভার ডেকে সিভিল সার্জনের গাড়ি বের করেন। মুখচোখ তেবড়ে মিন্টু দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। মুগ্ধ বিস্ময়ে সকল রোগী বিছানা থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে থাকে। আর তাদের আত্মীয়রাও। একজন নার্স নিজে থেকে এগিয়ে এসে মিন্টুকে গাড়ি পর্যন্ত ধরে নিয়ে যায়। হাত লাগায় ড্রাইভার। খোঁড়াতে খোঁড়াতে মিন্টু গিয়ে গাড়িতে ওঠে সন্ধ্যার মুখে।

ডিসি সাহেব, এসপি সাহেব আর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরা টেনিসের সম্ভাব্য গ্রিলঘরের দুরূহ স্থাপত্য নিয়ে ভাবা বাদ দিয়ে, এমনকি সান্ধ্যকালীন টেনিস-বল-পেটাপেটি খেলা বাদ দিয়ে অপেক্ষা করে ছিলেন রাণা ডাক্তারের জন্য। রাণা ডাক্তার নামার পর যখন তাঁর কাঁধে হাত রাখা মিন্টুকে দেখা গেল তখন এসপি ডিসিকে বললেন—

'দেখলেন, দেখলেন? সঙ্গে নিয়ে এসেছে।'

ডিসি পরিস্থিতির জটিলতা আন্দাজ করে বেশ ভড়কে গেলেন। গলা চড়িয়ে হালকা করতে চাইলেন পরিবেশ—

'কী ডাক্তার সাহেব বাদী সাক্ষী সব সঙ্গে করে নিয়ে এলেন?'

'দেখলেন ছার, আমি বাদী!' মিন্টু খুশি হয়।

'কী যে বলেন না! ছেলেটা আসতে চাইল। তাই নিয়ে এলাম।' ডাক্তার বলেন।

'আমাদের রিলেশন্স-এর মধ্যে আজকে আপনি হঠাৎ একদম ইমপ্রোপার টার্মস নিয়ে এসেছেন ডাক্তার সাহেব। আমি না বলে পারছি না।'

এসপি আসলেও না বলে পারছিলেন না। এতক্ষণের উত্তেজনায় তাঁর মুখ লাল হয়ে গেছে। একটু দুরে আমসি মুখে বসে আছেন হারুন ডাক্তার। চারজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং টিএনওর সঙ্গে আড্ডা জমানোর চেষ্টা করছেন। তাঁদের সকলেরই ভাবটা ছিল এমন যে এটা বড়দের ডিলিংস এবং তাঁরা ভিন্ন আড্ডা দেবার ব্যবস্থা করতেই পারেন। কিন্তু সেটা কিছুতেই জমছে না। এখন রাণা ডাক্তার মিন্টুকে নিয়ে এসে পুরো পরিস্থিতি জটিল করে দিয়েছেন। এখন নিশ্চিন্তে স্ট্যাটাস কুয়ো রাখা মুস্কিল হয়ে যাচ্ছে। সকলেই টেনশন নিয়ে বসে।

'আমি কীভাবে টার্মস ইমপ্রোপার করলাম? হাসপাতালে চুন থেকে পান খসলে টেলিফোনে আপনি হুকুম করেন না? সেটা কী তাহলে?'

'হুকুম করি! বলতে পারলেন এ কথা? সেগুলো তো ফ্রেন্ডলি সাজেশন!' এসপির প্রেশার বাড়তে থাকে।

'আচ্ছা আপনারা করলে ফ্রেন্ডলি সাজেশন। আর আমরা আপনাদের ডেপার্টমেন্ট নিয়ে কথা বললেই তা ইমপ্রোপার টার্মস।'

মিন্টু এইরকম একটা সালিশ দেখে মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝে না। কিন্তু পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে ভেবে মাটিতে নিজেই বসে পড়ে। বসতে গিয়ে মুখচোখ তেবড়ে ফেলে একবার। টেনিস কর্মচারীরা সবগুলো বাতি ভালমতো জ্বালিয়ে দেয়। সাহস করে মিন্টু ডিসির দিকে তাকিয়ে বলে বসে—

'ছার, আপনি মুরুব্বি মানুষ। আপনিই বইলে দেন।'

ডিসি মিন্টুর দিকে রাগত চোখে তাকাতে যাবেন, এমন সময় এসপি বলেন—

'হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই ভাল।'

ডিসি দিব্যি বুঝতে পারেন এখন বয়োজ্যেষ্ঠতা নিয়ে কথা হচ্ছে। পদজ্যেষ্ঠতা নিয়ে নয়। এত সহজে এসপি এসব ছেড়ে দেবার লোক নয়। সে কারণেই তিনি চরম হতাশ আর সন্দিগ্ধভাবে এসপির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু সে ক্ষণকাল মাত্র। অচিরেই তিনি বুঝতে পারেন যে একটা সুযোগ তাঁর হাতে শেষমেশ কুমড়াওয়ালাই দিয়েছে। আর সেটা হাতছাড়া করা ভাল হবে না।

'শোনেন এই কুমড়ো কিন্তু আমাদের রিলেশনে একটা মেটাফরও।'

'ইয়েস আই ডু এ্যাগ্রি। আমাদের সেন্স অব বিলংইং-এর একটা পরীক্ষা।' এসপি মাথা নেড়ে বলেন।

'আমাদের সোশ্যাল রেসপন্সিবলিটিরও।' রাণা ডাক্তার বলেন। ডিসি প্রমাদ গোনেন। কিন্তু কর্তব্যচ্যুত হন না।

'চলেন আমরা আমাদের এ্যাসোসিয়েশনটা আজ কুমড়ো দিয়ে সেলেব্রেট করি। রাতে আজও বসি চলেন। আমি ভেবেছিলাম বাসায় একটু তাড়াতাড়ি ফিরব আজ। কিন্তু এটা আরো সিরিয়াস। আমি বাসায় ফোন করি। আপনাদের ভাবি কুমড়ো দিয়ে আর বেশন না কি যেন দিয়ে যা একখানা চপ বানায় না! লুচি আর কুমড়োর চপ! কী বলেন!'

ভুরু নাচিয়ে ডিসি বলে চলেন। স্তম্ভিত মুখে সেদিকে তাকিয়ে থাকেন এসপি। তাকিয়ে থাকে মিন্টুও। স্তম্ভিতভাবেই। ডিসি আবারো বলেন—

'ব্যস। তাস, লুচি আর কুমড়োর চপ! হ্যাঁ? আর এখানেই এই কেইস মধুরেণ সমাপন। আমরা আবার আগের জায়গায়। কী বলেন?'

দুর্ঘটনাটার দিকে এসপি বিস্ফারিতভাবে তাকিয়ে থাকেন। মানে ডিসির মুখের দিকে। আর এতক্ষণ যাঁরা কার্যত কিছুই না শুনবার খেলা করছিলেন সেই ম্যাজিস্ট্রেটকুল একসঙ্গে বেজায় হৈচৈ করে বলে বসেন—

'স্যার, বেস্ট সল্যুশন স্যার। আর কিছুই হতে পারত না স্যার। স্যার আপনি গ্রেট স্যার।'

এসপি সাহেব কাতর চোখে কার দিকে তাকাবেন কিছুতেই বুঝতে পারলেন না। পুরো সালিশটা তাকে রেখেই হয়ে যাচ্ছে দেখে মিন্টু ভীষণ মনোকষ্টে ছিল। এই সময়ে ডিসি তাকেও সম্পৃক্ত করলেন—

'কী হে! তোমার কুমড়োর কপাল দেখলে?'

'কুমড়ো কিন্তু ছার ভাল তরকারি।'

নিজের কপালের এরকম হালও মিন্টুর মাথায় আসে না। সে কুমড়ার সম্মান নিয়েই মনোযোগী।

'সে তো বটেই। তা না হলে সবাই এত খুশি হতো! খেতাম আমরা কুমড়ো? বলো খেতাম?'

'ছার...।'

'হ্যাঁ বলো।'

ইতস্তত করেও মিন্টু বউয়ের কথা তুলতে পারে না। অথচ কুমড়ার পর তার এই এজেন্ডাটাই ছিল।

'...গিন্নির হাতে পইড়লে ছার কুমড়োর তুলনা থাকে না।'

'আচ্ছা আচ্ছা তা তুমি জানলে কীভাবে?'

'কী যে বোলেন ছার...আমি জাইনবো না!' লজ্জা পায় মিন্টু।

'তুমি কি আমাদের কথা শুনছিলে এতক্ষণ?'

ডিসি সাহেব ভাবেননি যে মিন্টু তাঁদের কথা বুঝেছে ঠিকমতো। অমনি সবাই, এসপি আর ডাক্তার ছাড়া, এক সাথে—

'স্যার ও বোধহয় ওর গিন্নির কথা বলেছে, ভাবির কথা বলেনি।'

'ওওও।'

জিভ কেটে মাথা দোলায় মিন্টু।

'ছি ছি! কী যে বোলেন না ছার। আমি কি তাই বইলতে পারি? ওনাকে তো আমি বইলতাম...কী বইলতাম...'

'ম্যাডাম, ম্যাডাম...' পেছন থেকে এক ম্যাজিস্ট্রেট বলেন।

'আপনারা দেখি আমার চাকরিটা খাবেন।'

ডিসি আর্তনাদ করেন।

'কেন স্যার কী হলো?' একসাথে তিনচার জন।

'আহা, ম্যাডামের একটা প্রোটোকল আছে না? এখন আমার বাড়ির লোককে ম্যাডাম ডাকলে চলবে?'

'ও হো হো। এই শোন ভাবি ডাকবে, ভাবি।' মিন্টুর দিকে সবাই বলে। মিন্টু সায় দেয়।

'আহা, ভাবি ডাকার কী দরকার!' ডিসি সাহেব সচকিত হয়ে ওঠেন—

'শোনেন, তাহলে প্রোগ্রাম পাকা। কী এসপি সাহেব চুপ কেন? কুমড়োটা আনান।'

'হ্যাঁ? হ্যা হ্যা।'

সকলের প্রবল উত্তেজনায় কেউ আর এসপি সাহেবের কাতর মুখটাকে খেয়াল করেন না। কেবল মিন্টু তখন একঝলক দেখে ফেলল। এবং পরম এক আত্মীয়ভাবে তাদের দুজনের চোখাচোখি হয়। এসপি সাহেব তাঁর কাতর চোখ মেলে রাখেন মিন্টুর চোখে। মিন্টুর মাথা খুলে যায়। সে তার থুতনি চুলকাতে শুরু করে—

'ছার, এতগুইলো মানুষ...কুমড়ো দুইটা হোইলেই ভাল হয়। আমি বাড়ি থেইকি আর একটা নিয়ি আসি।'

কারোরই আপত্তি ছিল না। আর এসপি সাহেবের ধড়ে প্রাণ ফিরে এল।

'শোন তোমার বাড়ি থেকে একটা, আর আমার বাসা থেকে একটা। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ ছার।' মিন্টু মাথা নেড়ে নিশ্চিত করে যে সে বুঝেছে। এসপি সাহেবও বুঝতে পারেন।

'যা করার তাড়াতাড়ি করো বাপু।'

ডিসি সাহেব চপের গন্ধ পাচ্ছেন।

'আমার ড্রাইভার নিয়ে যাবে। এই...'

এসপি গলা চড়ান অনেকক্ষণ পরে।

'কেন আমার ড্রাইভার নিয়ে যেতে পারে না?'

রাণা ডাক্তার বলেন।

চতুর্থ আর পঞ্চম কুমড়ার নিকেশ করে মিন্টু ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গিয়ে রাণা ডাক্তারের কানের কাছে দাঁড়াল। গাছে পাকা কুমড়া মিন্টু গুণেছে ছয়টা। কানে মুখ ঠেকিয়ে বলল—

'গাড়ি একটা নিলিই হয় ছার। আপনার বাসাতে যাবই।'

'কেন কেন?' ফিসফিসিয়ে বলেন ডাক্তার।

'কুমড়ো ছার আপনার বাসাতিই কেবল জবাই হয়নি। সব বাসাতেই হইয়েছে। একটা দিয়ি আসব।'

এবারে গোলগোল হয় রাণা ডাক্তারের চোখ। এসপি উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে মিন্টুর দিকে। অন্য সকলে সালিশে খুশি। ঘুরে মিন্টু মাটিতে গেড়ে বসে ডিসির দিকে তাকায়—

'ছার, একটা কথা...'

'হ্যাঁ বলো...'

'ছার...আমার গিন্নিকে নিয়ি আসি। ম্যাডামকে হাত লাগাতে পাইরবে।'

'আহা হা তুমি তো কুমড়ো দিয়ে দিলেই হয়। তোমারও তো আসার দরকার নেই।' ডিসি বলেন।

'না না নিয়ে আসো। সমস্যা নেই। আমি গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে আসব।' এসপি এক গলা চড়িয়ে বলেন।

'ঠিক আছে, যাও।' ডিসি বলেন। 'আর শোন, ওই ইয়ে...আপাই ডেকো বুঝলে?'

মিন্টু আবারো মাথা নেড়ে সায় দেয়। ডিসি সাহেব এসপি সাহেবের ড্রাইভারকে ডেকে বুঝিয়ে দেন বিধিব্যবস্থা।

ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এসপির গাড়ির দিকে যায় মিন্টু। একগাল হাসি সমেত হাত নেড়ে সী অফ করেন এসপি। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে। এত খুশিতে কেবল বিজয় দিবসের স্যালুটটাই নিতে দেখা যায় তাঁকে।

রাণা ডাক্তার বিমর্ষ হয়ে পড়েন এবার।

একটি [জাপানী] মোরগ কাহিনী

শেষরাতে ঘুম ভেঙে গেলে, কিংবা শেষরাত পর্যন্ত ঘুমানো না হলে, পিচের রাস্তায় ঘষঘষ করে চলতে থাকা রহস্যমাখা অদেখা গাড়িগুলো গম্ভীর শব্দ করে চলে। চারপাশে পাহারা দিয়ে থাকা পাহাড়গুলো সেই শব্দটাকে বিপুল বানিয়ে দেয়। ঘন সেই রাতে পরিচিত কানে ফজরের আজান শুনবার আকুতি জমা হয়। কিন্তু এখানে আজানের রেওয়াজ নেই। ফলে আধভাঙা কিংবা আধজড়ানো ঘুমের মধ্যে মনে পড়ে এখানে আজান হয় না। আর ঠিক তখনই একটা মোরগ তারস্বরে ডেকে ওঠে। 'অক্কঁকর অঁ অ অ'। এরপর ডাকে আরেকটা। তারপর আরো অনেকগুলো। অনেকক্ষণ ধরে তাদের ডাকাডাকি চলতে থাকে। সকালের ঢের আগে সকালের আগমনী বার্তা দেয়া মোরগদের জন্য একটা সাধারণ ব্যাপার।

আর মোরগগুলো যখন ডাকে তখন হিগাশি-হিরোশিমার পাহাড়গুলো একটুও আড়মোড়া ভাঙে না। তাদের ঘুমন্ত, অথচ সজীব, শরীরগুলো কুয়াশাহীন আকাশের নিচে ফিকে আলোয় মাখামাখি হয়ে থাকে। তখন, এখনো মৌসুমের প্রহর গুণতে থাকা, চেরি গাছেরা রাস্তার পাশে পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। নাগেশ্বরের উৎকীর্ণ পাতারা পর্যটক নিশাচর পতঙ্গগুলোকে আতিথেয়তা করে। বিকেলের হঠাৎ বাতাসে আবারো যে পাতারা উড়ে চলে গেল সেগুলোর শোকে তখন ম্যাপল গাছেরা স্তব্ধ হয়ে থাকে। আর অজস্র নাম-না-জানা গাছেরা তাদের নবলব্ধ রঙিন শরীর, এই শীতের উপহার, নিয়ে মোরগের ঝুঁটির স্বপ্ন দেখে। মোরগগুলো সেকথা জানতেও পারে না।

কেবল কার্তিকের বিদায়ী জ্যোৎস্না ঘোড়ার আস্তাবলের সামনের মাঠে বিস্ফারিত শুয়ে থাকে। সেই বিদারিত জ্যোৎস্নার কাল, কিংবা পূর্ব-সকাল, মোরগদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়। চৌকোনা জানালাগুলো থেকে মাথা গলিয়ে দেয় তারা। আর ঘোড়ারা সেদিকে ফিরেও তাকায় না। কিংবা অতদুর থেকে তারা ঠাহর পায় না মোরগদের চন্দ্রাহত মুখ। মোরগেরা জ্যোৎস্নায় বুঁদ হয়ে থাকে। সকালের আগমনী বার্তা জানানোর কথা তখন তারা ভুলে যায়। আর সকালের তখনো অনেক অনেক দেরি।

এভাবে নেহায়েৎ ইচ্ছা-নিরপেক্ষ একটা জটিল ক্রীড়া মোরগদের জীবনে নেমে আসে। যে জ্যোৎস্নায় চারধার—সামনের বিস্তীর্ণ বেইস-বল মাঠ, ঘোড়ার আস্তাবলের ছাদ, ম্যাপলের সারি, ঘনকৃষ্ণ পাহাড়ের বৃক্ষরাজি, হঠাৎ গাড়ির শব্দে সচকিত নির্ঘুম রাস্তারা—প্লাবিত হয়ে থাকে, সেই জ্যোৎস্নায় মোরগেরা আত্মহারা হয়, বিস্মৃত হয় আশু জৈবনিক কর্তব্য। তাদের চন্দ্রাহত মুখে চাঁদের অবয়ব মাখামাখি হয়ে যায়। ঘোর-লাগা বিস্ময়ে পরস্পরকে অবলোকন করে তারা। আর বিস্মৃত থেকে যায় খানিক সময়। তারপর আবার যখন একজন বা দু'জনের মনে পড়ে তখন তারা সকালের আগমনী বার্তা জানান দেয়। আবার ভ্রান্তিমোচন ঘটে যখন সত্যি সত্যি চাঁদের মুখ দেখবার অবকাশ হয় তাদের। এভাবে সকাল হবার ঢের ঢের আগে মোরগেরা চন্দ্রালোকশিহরিত হয়ে ভুলের খেলায় সামিল হয়। উত্তেজিত থাকে, বিব্রত হয়, আবার উত্তেজিত হয়, আবার বিব্রত হয়। পরিশেষে বিষাদাক্রান্ত হয়ে সত্যিকারের সকালের অপেক্ষায় থাকে।

পিচের রাস্তার সঙ্গে বিনিদ্র রাতগুলো কাটায় তারা জ্যোৎস্নাভরা রাতে। তারপর সত্যিই যখন সকাল হয় তখন সাথিদের অনেকেই গভীর ঘুমে মগ্ন। সকাল আসে প্রায় নিশ্চুপে, মোরগদের ভুলে-ভরা জীবনের প্রতি আরো এক দফা উপহাস হয়ে। ঘুম ভাঙে তাদের, আসলেই, বিষাদমাখা সকালে।

আর সকাল হলেই তাদের চাকরি-জীবন শুরু হয়ে যায়।

কীভাবে যে, আর কেনই বা, কুঠুরির মধ্যে জীবনচক্র এসব মোরগের স্থিত আহ্বান-আকাঙ্ক্ষা—সে এক বিস্ময়। নাহলে এসকল মোরগ যদি অনবগত হয় প্রতিটি সকালে তাদের সম্ভাব্য আগমনী-গান, কোথাও তো এতটুকু ছন্দোপতন ঘটে না। কেই বা কুঠুরির মোরগের কণ্ঠে আহ্বান শুনে তারপর সকালের হিসেব কষেছে! কেই বা তার

কালের প্রবাহে এতটুকু ছেদ দিয়েছে যেখানে মোরগের জীবনমাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ হয়, কিংবা অন্ততঃ শ্রুত হয়, কিংবা অনুভূত হয়। সেই ব্যক্তিক কালটুকু কোথাও নেই। এইসব জ্যোৎস্নালিপ্সু মোরগেরা সেসব ভেবে দেখে না। কোন যোজন কালের অতীতে লব্ধ তাদের জৈবিক প্রেষণা, বেসিক ইন্সটিংক্ট, সেই থেকে দিনলিপির অংশ হয়ে আছে। সেই দিনলিপিও এক ইচ্ছা-নিরপেক্ষ কর্মসূচি, এক আত্মগত তাগিদ।

ফলে, উপলব্ধি করা যায়, মোরগদের বিষাদমাখা সকাল নিছকই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বিভ্রান্তির অনুপুঙ্খ বর্ণনা নয়। যে অবধারিত কর্তব্য তাদের ডাকতে থাকে সম্মুখের শুয়ে থাকা বেইস-বল মাঠে, ঘোড়ার আস্তাবলের ছাদে, পাহাড়ের অনিন্দ্যসুন্দর ভাঁজে—সেই কর্তব্যবোধ প্রতিটা সকালে ছাঁচবাঁধা কুঠুরির মধ্যে রাখা পিপাসার-পানির মতো চরম গ্লানির হয়ে টলায়মান থাকে।

অথচ সকাল হলেই তাদের চাকরি শুরু।

তাদের চাকরির সম্পূর্ণ দেখভাল করেন একদল তরুণ-তরুণী। তাঁরা সকলেই বিজ্ঞানী। তাঁদের সবারই সাদা রঙের এ্যাপ্রন। মোরগগুলোর ওজন আলাদা আলাদা করে দেখেন তাঁরা। সেগুলো খাতায় টুকে রাখেন। প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে এসব দিয়ে তাঁরা তালিকা বানান, সারণী বানান, তারপর রেখাচিত্র দিয়ে বোঝান এগুলোর প্রাত্যহিক উন্নতি। এরপর খাবার তালিকা ধরে ধরে কুঠুরির সামনের পাত্রগুলোতে নির্দিষ্ট মাপের নানা স্বাদের খাবার রেখে দেন। এমন নয় যে মোরগদের সেই খাবারগুলোকে অনেক রুচিকর লাগে। কিন্তু তারা অভ্যস্থ। খাবারের সাথে পথ্যও মিশিয়ে দেয়া হয়, কিংবা ওষুধ। আর মাঝে মধ্যে এইসব বিজ্ঞানী মোরগদের শরীরে সুঁচ দিয়ে ইঞ্জেকশন দেন। এসব নিয়মবাঁধা কাজের মধ্যে মোরগদের চাকরি হলো নির্বিবাদে সবকিছু করতে দেয়া। মোরগেরা তাই করে। যারা ডিম পাড়ে তাদেরও ডিমে তা দেবার দরকার পড়ে না। এইসব বিজ্ঞানীরা ডিমগুলো নিয়ে যান। কিছুদিন পরে অন্য কুঠুরিতে বাচ্চারা এসে জোটে। জানারও উপায় নেই সেগুলো ওই ডিমেরই কিনা। মোরগেরাও তা জানতে চেষ্টা করে না। কেবল কিছু দিন পরপর কিছু মোরগকে নিয়ে যাওয়া হয়, তারা আর কখনো ফেরে না। এই হলো মোরগদের চাকরি।

হিগাশির বেইস-বল মাঠের পাশে যে মোরগেরা এমত দিনলিপিতে প্রাত্যহিক বাঁচে তারা জানেও না মোরগদের জীবনে কী ভীষণ বদল ঘটেছে। তারা জানেও না কোনটা মোরগ-জীবন আর কোনটা কুঠুরির কাল। পোলট্রির বিকাশ নিয়ে কিছুমাত্র ধারণা নেই তাদের। তাহলে এই সকালগুলো বিষাদে ভারী হতো না। পরন্তু এটা তো পোলট্রিও নয়। এটা হচ্ছে বিজ্ঞানাগারের সম্প্রসারণ। নেহায়েৎ দেখতে একটা পোলট্রি-খামারের মতো। কিন্তু প্রতিটা সকালে যে বিজ্ঞানীরা আসেন এটা হচ্ছে তাদের পরীক্ষার কাল। মোরগেরা সেটা জানেও না। জানলে কিছুতেই তাদের সকালগুলো এমন হয় না। জানলে আরো একটা জ্যোৎস্নার রাত্রি তারা অপেক্ষায় কাটায় না। জানলে তারা ঘোড়াদের ছাদে বসে চাঁদের প্রহর কাটাবার সাধ করে না। জানলে হিগাশির পাহাড়গুলো, হ্রস্বদৃষ্টিতে যেগুলো রহস্যময় গাঢ় অন্ধকার লাগে মোরগগুলির, তাদেরকে অযথা মায়াবী ডাকে পাগল করত না। কিন্তু মোরগদের সেই অজ্ঞতা-হেতু নিদারুণ যন্ত্রণায় কাটে। সে কথা কেউই জানে না। এমনকি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ারাও না।

এভাবে যখন সমস্ত ম্যাপল গাছেরা পত্ররাজি বিসর্জন দিয়ে আধমনা মন্ত্র জপে চলে, যখন সাকুরা গাছেরা মাথা মুড়ে আসন্ন বসন্তের স্বপ্নে তুষারের অন্তর্বর্তী কালের সমীপে, যখন হঠাৎ হঠাৎ আবছায়া কুয়াশা চাঁদের সম্মুখে পর্দা বিছায়—তখন কোনো এক নবীন শীতের রাতে মোরগদের নিবাসের একটি জানালাকে বিস্তৃত দেখায়। একটি মোরগের মুখ সেখানে। মোরগটা প্রথমে সেটা বোঝে না।

মধ্যরাতে কুয়াশার ঝালর খানিক কেটে জ্যোৎস্না আস্তাবলের সম্মুখের মাঠে, আস্তাবলের ছাদে বিস্তরণশীল হয়। তখন অমোঘ নিয়মে চন্দ্রাহত মোরগের সারি কুঠুরি থেকে মাথা বের করে। প্রকাশ্য চাঁদের আলোতে সারি সারি মোরগের মুখ – চন্দ্রাহত, বিস্মিত, ঘোরলাগা।

এবং আবারো একটি দুটি মোরগ বিভ্রমের ডাক শুরু করে। আবারো বিব্রত হয়ে বিরতি দেয়। এভাবেই জ্যোৎস্না বোধন চলে তাদের।

ঠিক তখনি...

ঠিক তখনি বিস্তৃত জানালায় মোরগটা টের পায়। যে অতীতের কর্তব্যবোধে প্রতিটি বান্ধব তার প্রদোষে বিষন্ন মুখে থাকে, সেই অতীত মোরগটার বুকে এসে থমকে দাঁড়ায়। ছোট্ট বুকটাতে সে অজস্র কালাকালের দম ভরে নেয়। সারি সারি কুঠুরি। সারি সারি মুখ। সেইসব মুখেদের সাথে নিত্য বসতি তার। আজ আবছায়া-অন্ধকারে, জ্যোৎস্নার মায়াবী প্রাক-ভোরে, কিছুমাত্র বিভ্রান্ত হয় না সে। সকালের অভিমুখে যাত্রা করবার প্রস্তুতি নেয়। অনতি শরীরখানা দৈবাৎ বিস্ফারিত জানালায় চাপ দিয়ে বের করে সে। একবার সাথিদের সাথে দৃষ্টিবিনিময় করে।

মুহূর্তে সেই বার্তা সঞ্চালিত হয়। প্রতিটি কুঠুরিতে, কুঠুরির জানালায়, প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি চালায়। সকল মোরগ সেই ক্রান্তিকালের সংবাদে শিহরিত হয়। সকল মোরগ দম নিয়ে জানালায় উদ্‌গ্রীব থাকে। তারপর শহর বিজয়ের প্রাক্কালে গণবাহিনী যেমন ক্লান্তভাবে, তথাপি দৃপ্তস্বরে, কলরব তোলে—মোরগেরা সেইমতো সম্মিলিত কণ্ঠে সোল্লাস ধ্বনি দেয়—

‘অক্কঁকর অঁ অ অ’।

হিগাশির আকাশ, সেই মধ্য কিংবা প্রান্ত রাত্রে, এক লহমায় কেঁপে উঠল। আর একথা তখন জ্যোৎস্নার থেকেও উদ্ভাসিত। এই বার্তা সকালের আগমনী-বার্তা নয়। এই বার্তা জাগরণী-বার্তা। এই বার্তা অকুতোভয়, কর্তব্য-সচল, রহস্যোন্মুখ এক মোরগের অলিখিত এক অভিযাত্রার বিজয় ঘোষণা। হিগাশির পাহাড়গুলোতে, খাঁজে খাঁজে যার অপার নিমন্ত্রণ, সুনিশ্চিত বেয়ে চলা, আর সত্যিকার এক সকালে পাহাড়-চূড়ায় এক সারথির সত্যিকার আহ্বান শুনবার কাঙ্ক্ষা—মোরগেরা আকাশ কাঁপিয়ে কুশল জানাল।

কাঠের কুঠুরিশালাকে পেছনে রেখে মোরগটা হাঁটতে লাগল। তার অভিযাত্রার সেই লগ্নে জ্যোৎস্না ম্লান হতে শুরু করে।

মোরগটা কয়েক কদম হেঁটে লোহার রেলিংঘেরা বাগানের মাথায় এসে যখন রেলিং টপকানোর কথা ভাবছে তখনই প্রথম সে অনুভব করে তার দ্বিধা। কখনোই সে তার হাঁটার বিদ্যা পরখ করে দেখেনি, কিংবা দেখেনি তার ডানায় কিছুমাত্র উড়বার সামর্থ্য আছে কিনা। কখনোই সেই সুযোগ তার হয়নি। কেবল সুদূর অতীতের এক জৈবলিপি তার মগজে অঙ্কিত সে টের পায়। সে বিশ্বাস করে এসকল সামর্থ্য নেহায়েৎ জন্মসূত্রেই তার পাওনা। কিন্তু সেই রেলিংটাকে উড়ে পার হবার বাসনায় সে বারকয় ডানা ঝাপটানি দিয়ে উপলব্ধি করে উড়বার ক্ষমতা তার লুপ্ত। কিংবা উড়বার ক্ষমতা কখনো সৃজিতই হয়নি। কাঠের কুঠুরি থেকে নামতেও সে ডানা মেলেছে। কিন্তু তখন অবনয়নের কালে সে বিস্মৃত ছিল। বিস্মিত, স্তম্ভিত সেই মোরগ বিষন্নভাবে আবারো উপরের দিকে তাকায়। জ্যোৎস্না সেখানে আরো ম্লান হয়েছে। আর একটু একটু করে আটপৌরে পাহাড়ি মেঘেরা আসা যাওয়া করছে।

যেভাবে সে কাঠের কুঠুরি থেকে শরীর দুমড়ে বের হয়েছিল সেভাবেই আনত করে তার শরীরকে। তারপর রেলিংয়ের নিচে জমে থাকা একদঙ্গল গুল্মগাছের গোড়া থেকে শরীরটা সমেত বাইরের পিচের রাস্তায় ওঠে। এরপর একবার গা-ঝাড়া দেয়। যেন এইমাত্র আবিষ্কার-করা তার উড্ডয়ন-ব্যর্থতা এই ঝাড়াতেই ঝেড়ে ফেলল সে।

পিচের রাস্তায় উঠে সে নিকটবর্তী পাহাড়টার অস্তিত্ব বুঝতে চাইল। একবার পেছন ফিরে ফেলে-আসা কুঠুরির দিকে তাকিয়ে দেখল। আবছায়া অন্ধকারে, আর তার দৃষ্টির অস্বচ্ছতা হেতু, সে ঠাহর করতে পারল না তার সাথিদের উৎসুক সমাবর্ত মুখ। কিন্তু সে স্থির বিশ্বাসে জানে সেইসব বান্ধবেরা নিবিড় আস্থার সাথে তার সাথে পথপাড়ি দেবে। কেবল তারা সাথে নেই এই যা। শেষবারের মত বিদায় জানায় সে।

চিপসের যে ঠোঙাটা ল্যাম্পপোস্টের গোড়াতে পড়ে রয়েছে, মোরগটা সেটা ডিঙিয়ে চলে গেল। তারপর দু' কদম গিয়ে আবার ফিরে আসল ওই চিপসের ঠোঙার কাছেই। তার সংকল্প কিছুমাত্র ব্যহত নয় যদিও, তথাপি এতদিনের পথ্যাহারে সে পরিশ্রান্ত বোধ করেছে। এই ঠোঙার গন্ধ তাকে আকৃষ্ট করায় সে ঠোকর দিয়ে দু'চার দানা খেল। তারপর আবার মোড়ের দিকে হাঁটতে থাকে।

রাস্তায় মানুষেরা নেই। তাদের শকট নেই। তাই ট্রাফিকের বাতি রুটিন মাফিক জ্বলছে আর নিভছে। মোরগটার তা নিয়ে ভ্রুক্ষেপ ছিল না। এইসব বাতির কোনো আবশ্যকতা নেই তার জীবনে। বিশেষতঃ যে ব্রত নিয়ে আজ সে অতিক্রান্ত হয়েছে এতগুলো প্রাচীর, সেখানে এসব আলোর আর কোনো তাৎপর্য নেই। যে-কোনো আলোতেই সে এখন কেবল সামনেই যাবে। তার অভিলক্ষ্য এখন কেবল সামনের ওই পাহাড়। যে পাহাড়টাকে সে ঠিক দেখতে পাচ্ছে না নেহায়েৎ দৃষ্টির অক্ষমতা হেতু। কিন্তু যার অস্তিত্ব যে চন্দ্রালোকে ঠাহর করেছে এতকাল কিংবা আরো কোনো দৈব জ্ঞানে সে পাহাড়ের অস্তিত্ব বিষয়ে সজাগ। মোরগটা হাঁটতেই থাকে।

মোড়ে পৌঁছেই মোরগটা অনুভব করে তার দুই উরু সটান হয়ে গেছে। তার পায়ের পাতায় শরীরের ভার বইবার সামর্থ্য অবলুপ্ত প্রায়। মোরগটা তার জৈবলিপির বার্তার আচানক সংকটে হতচকিত বোধ করে। কিন্তু সম্মুখে চলবার ব্রতে তার বিরতি দেবার উপায় নেই। রাস্তা পাড়ি দিয়ে সে ওপারে পৌঁছায় পাহাড়ে যাবার সড়কটা ধরবে বলে।

এই মোরগটা জানে না, এমনকি যে সাথিরা তার প্রতিটি কুঠুরি জানালায় উদগ্রীব দাঁড়িয়ে রয়েছে তারাও অজ্ঞাত, এইসব মোরগের জৈবলিপি গবেষণাগারে গড়া। তারা অজ্ঞাত যে তাদের মস্তিষ্কের জৈবলিপি এক মরীচিকা। তারা অজ্ঞাত যে তাদের শরীরেরা নিছকই উৎপাদিত পিÉ। মাংশের পিÉ বই কিছু তারা নয়। এমন এক মাংশের পিÉ যা সচল থাকে কেবল আরো মাংশল হবার নিমিত্তে। এইসব মোরগেরা জানে না। জানলে তারা কিছুতেই সারথিবিহীন এক সাথিকে হিগাশির পাহাড়ে চড়বার স্বপ্নে মাখামাখি হতে দিত না। আর জানত না এই মোরগটিও। তাই তার দৃপ্ত পা যখন পাহাড়ে চড়ার সড়কের মাঝপথেই মুচড়ে গেল সে তীব্র ব্যথার মধ্যেও স্তম্ভিতই হয়েছে বেশি।

আবছায়া আলোর মধ্যে সেই সড়কে বুক পেতে বসে যায় মোরগটা।

মোরগটা যখন তার অভিযাত্রার নিদারুণ অহংকার একটি পায়ের পাতার দুমড়ানিতে অনিচ্ছুক জলাঞ্জলি দিতে বসেছে তখন দৃষ্টিতে তার সাথিদের চঞ্চল উৎসুক মুখেরা ভেসে বেড়ায়। মোরগটার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। জ্যোৎস্নার সঙ্গে টানা দ্বৈরথ শেষে সবেমাত্র মেঘেদের দল আকাশ পরিভ্রমণে বেরিয়েছে। মোরগটার সাথে তাদের চোখাচোখি হলো। মোরগটা পাহাড়ের পথ খুঁজে পায়। সে বুঝতে পারে যে সাথিদের সেই কুঠুরিতে, চালাতে রেখে এসেছে এই মেঘেদের সঙ্গে তাদেরও দেখা হবে। আর তারপর তারা কেবল তার পাহাড় বিজয়ের বার্তাই জিজ্ঞেস করবে। মোরগটার আর ফেরা হয় না।

এরপর বাম পা-টা টেনে টেনে মোরগটা পাহাড়ের পথে ওঠে।

পিচের রাস্তাটা যেখানে এসে বেঁকে গেছে সেখানে খাড়া একটা সিঁড়ি। ছোট্ট পাহাড়ে মানুষের চড়বার জন্য আরামপ্রদ ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যবস্থায় মোরগটার কিছুমাত্র স্বস্তি হয় না। সে সিঁড়িটার দিকে হতাশ হয়ে তাকিয়ে থাকে। সত্যিই তার ডানা অচল কিনা সেই পরীক্ষা আরেকবার সারে। এই ডানাজোড়ার আবশ্যকতা কী এই প্রশ্নে মোরগটা বিপন্ন বোধ করে। আরো বিমর্ষ হতে গিয়ে তার মনে পড়ে বিমর্ষতায় শক্তি ক্ষয় হয়। আর সূর্য উঠবার অনেক দেরি নেই।

সিঁড়িটাকে ডানপাশে রেখে সে গাছেদের মাঝ বরাবর চড়তে চায়। উইলোর ডালগুলো এবড়ো থেবড়ো মাটিতে পড়ে। সেখানে মাথা গলিয়ে মাটির সন্ধান করে মোরগটা। কারণ সে লক্ষ্য করেছে লাফ দিতে গেলেও তার ডানার প্রয়োজন পড়ে। প্রথম সারি উইলোকে ডিঙোবার পর অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে সে। মাটি এখানে খাড়া

নয়। তার সামনে দিয়ে একটা বেজি দ্রুত দৌড়ে যাবার সময় তাকে বিস্মিতভাবে দেখল। কিন্তু আরেকবার ফিরে এল না।

মোরগটা হাঁটছে।

লালচে পাতারা মাটিতে পড়ে রয়েছে। কিছু কিছু পাতা হলদেটে। কিছু পাতা বাদামি হয়ে গেছে। মোরগটা বুঝতে পারে আরেক সারি গাছের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সে। বাম পা-টা সে প্রায় বুকের মধ্যে গুঁজে নিয়েছে। এখন ওর হাঁটা প্রায় লাফানোর মতো। এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সে চলেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে আরো ঘন মেঘের আনাগোনা দেখতে পেল। তবে কি আজ সূর্যের দেখা সে পাবে না!

লালচে পাতাদের গাছগুলোকে ডিঙোতেই মোরগটার সামনে পাহাড়ের গোল মাথাটা দৃষ্ট হয়। উজ্জ্বল, আলোকময় এবং বৃক্ষরহিত। মোরগটা তার ডান পায়ে আরো জোরে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে থাকে। এই তো সে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এসে পৌঁছেছে। গোলাকার পাহাড়চূড়ায় পৌঁছেই সে বুকের ওপর শুয়ে পড়ে। তার বিস্মিত বিজয়ী চোখ তবু সে খুলে রাখতে পারে না। অবসাদে চোখ বুঁজে তন্দ্রালু হয় সে। সারি সারি সাথিদের মুখ দেখতে পায় সে। তখনি তার ঘোর কেটে যায়। সকল শক্তি জড়ো করে ডান পায়ে ভর দিয়ে পুবের আকাশে তাকায় সে। তারপর আকাশের দিকে ঘাড় উঁচু করে সে হাঁক ছাড়ে—

'অক্কঁকর অঁ অ অ'

মুহূর্তে সম্মুখের অন্য পাহাড় থেকে সেই বার্তা প্রতিধ্বণিত হয়। সমাগত হয় হিগাশির আস্তাবলের মাঠে। আর তার পাশে থাকা হাজার হাজার মোরগের কুঠুরিতে। তারা সমস্বরে তাদের সূর্যসাথির পাহাড় বিজয়ে তোপধ্বণি দেয় –

'অক্কঁকর অঁ অ অ'

আর তখনই মেঘের আলতো ছোঁয়া মেখে মৌসুমের প্রথম তুষার ঝরে পড়ে। খুব আলতো পালকের মতো।

মোরগটা ফিরতে শুরু করে।

সেদিন দুপুরে শহরের তুষারকর্মীরা যখন তুষারস্নাত রাস্তা পরিষ্কার করছে, তুষারের চাঁইয়ের মধ্যে তারা ডানা-ভাঙা এক মৃত মোরগ আবিষ্কার করে।

সবাই অবাক। হিগাশি-হিরোশিমাতে বনমোরগ!

ওস্তাদ

তাঁর বা পা-খানা মেঝেতে লাছানো। আর সেটার সঙ্গে হারমোনিয়ামটা ঠেসে রেখেছেন। ডান পা হাঁটুভাঁজে খাড়া করে রাখা। এখান থেকে দাঁড়িয়ে ঘাড়ে ঝুলতে থাকা কুচকুচে তেল মাখা চুলের প্রান্তসীমা সবচে আগে চোখ পড়ে। ঘন জাম রঙের হারমোনিয়ামের শরীরে তাঁর ঘন বাদামী দুই হাত, হাতের আঙ্গুল। বাহুসীমার ওপরে তাঁর ঘাড়ে ঐ চুলের প্রান্ত। কিন্তু মুখমÉলে কী তরঙ্গ এই আঙ্গুল বেয়ে, চুলের ঢেউয়ের ঠিক কিনার ঘেঁষে থাকা কান বেয়ে চলাচল করছে তা ঠাহর হয় না। কেবল হারমোনিয়ামে সহজিয়া কীর্তনের একটা সুর। তাই আমি নিশপিশ করতে করতে, তাঁর সামনে রাখা টুলে বসে পড়ি। তাঁর মুখের ঐ তরঙ্গ দেখব বলে। তিনি সেই টুলে আরো আগেই আমায় বসতে বলেছিলেন। আমি বসেও ছিলাম। আবার উঠে পড়ি সম্মুখে রাখা সরস্বতীর দেবীর ছবিখানা দেখতে। তাঁর মুখের তরঙ্গ একেবারে মুখোমুখি বসেও আমি তল পাই না। অথচ এই কাজটাই তিনি সারাদিন করছেন, হয়তো রাতেও। প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ এবং প্রতি বছর করছেন।

রিয়া আর আমি যখন শাঁখারী বাজারে ঢুকি তখনো আমাদের উত্তেজনার কমতি ছিল না। সেই উত্তেজনা সমেতই প্রথমেই আমরা একটা রেঁস্তোরায় বসেছিলাম। আর চা খাচ্ছিলাম। রিয়া আমাকে সরু চোখে দেখছিল। আমার মুখে তখন হারমোনিয়াম কিনবার টইটম্বুর খুশি মাখাজোখা হয়ে আছে। রিয়া আমাকে চেনে। আমার মুখমÉলের প্রতিটি যাতায়াত ওর নিশ্চিত দখলে। ফলে ও যখন আমায় সরু চোখে দেখে তখন আমার মুখমÉল আরো, ক্রমশ আরো, পরিস্ফুটিত হতে থাকে। কোনো অবরোধ আমার তখন দাঁড়ায় না। ফলে রেঁস্তোরা থেকে বেরিয়ে যখন একটা হারমোনিয়ামের দোকান খুঁজছি তখন আমার দুইগুণা খুশি। হারমোনিয়াম আর রিয়া। এই দোকানে ঢোকা হয়েছে দৈবাৎ। উত্তেজনাটা কয়েক প্রস্থ বেড়ে গেল এই লম্বা চুলের হারমোনিয়ামওয়ালার সামনে। এই নিবিষ্ট লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকাও একটা আনন্দ। আমি জানি এই আনন্দে বুঁদ হয়ে আছে রিয়াও। কিন্তু রিয়া আমার মত নিশপিশানিতে ভোগে না। ওর মুখে তাকিয়ে দেখি ভীষণ আত্মগত একটা প্রসন্নতা সেখানে লেপ্টে আছে। আমাদের হারমোনিয়ামওয়ালা কীর্তনের সুর বাজিয়েই চলেছেন। এই যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর নিবিড় বসতি।

এমন আহামরি কোনো হারমোনিয়াম এটা হবার কথা নয়। এমন কিছু টাকা আমরা খরচ করছি না। গোড়াতেই আমরা তাঁকে সেটা বলেছি। তিনি সেটা শুনে আত্মস্থ করলেন, গম্ভীর মুখে। খানিকটা সময় নিলেন। তারপর পাশের ছোট্ট দরজার ওপারের ঘর থেকে এই হারমোনিয়াম নিয়ে এসে বাজাতে শুরু করলেন। দুজন কারিগর আমাদেরকে একটু সময় দেখে নিলেন। তারপর তাঁদের প্রতিদিনকার কাজে মন দিলেন। ছোট্ট হাতুড়ি দিয়ে ছোট ছোট পেরেক কাঠের গায়ে বসাচ্ছেন। আর এই লম্বাচুলের লোকটার যে আমাদের তেমন করে দেখার দরকার আছে তাও মনে হলো না। অথচ তিনি, কীর্তনের সুরটা বাজাতে বাজাতেই, যে কথা বললেন তাতেই বুঝলাম একটা নিবিড় পাঠ তিনি এরই মধ্যে নিয়ে ফেলেছেন।

'আপনি পছন্দ করেন ওস্তাদ। এটাকেই জুড়ি বানিয়ে দেব।'

'জুড়ি হারমোনিয়াম তো চাই না আমার।'

'তো, আপনি এই হারমোনিয়াম নিয়ে কী করবেন?'

পরম একগাল হাসি দিয়ে হারমোনিয়ামওয়ালা বললেন। এই প্রথম তাঁর হাসি। স্বচ্ছল এবং ভরপুর।

'জুড়ি দিয়েই বা কী করব!'

আমার রসিকতা অনুমান করে আমাদের হারমোনিয়ামওয়ালা এরপর মাথা নামিয়ে দুপাশে দোলাতে লাগল। মুখে তাঁর হাসি আমি জানি। তাঁর মুখের অবিচল তরঙ্গগুলো তখন আর আমাকে ভোগায় না। তিনি হাসছেন তখন। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝে পাই না একটা জুড়ি হারমোনিয়াম তিনি গছাতে চাইছেন কেন।

'ওস্তাদ আমারে ফাঁকি দিতে পারবেন না। কোন পাট্টি আপনার?'

তিনি আবার চোখ তুলে জানতে চাইলেন। আমি বিপন্নভাবে রিয়ার মুখের দিকে তাকালাম। ও তখন বরাবরের মতই নিস্পৃহ মুখে সকল কিছু দেখছে। এবং জানি এই মুহূর্তে নিরঙ্কুশ কৌতুক বোধ করছে একমাত্র ও। আমার বিপন্নতায় তেমন সাহায্য পাব না বুঝে আমি নিজেই সচেষ্ট হই।

'ওস্তাদ, আমি পার্টির লোক না। এমনিই হারমোনিয়াম কিনতে এসেছি। আমার এক কলিগের জন্য।'

'ঠিক আছে, বলতে না চাইলে না বলবেন। আপনি যা নিতে চান তাই দেব। জুড়ি দেবার দরকার নেই।'

লম্বা চুলের ওস্তাদ কারিগর তখন নিজের কাজে মন দিলেন। তাঁর শেষ কথাটা বোধহয় খানিক বেদনার্ত শোনাল। আর আমার তখন কলিগের উপর অর্থহীন একটা রাগ হতে লাগল। ওর হারমোনিয়াম ও কিনতে এলেই পারত। কারিগরের তখন এদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একমনে, চাবিগুলোর ঢাকনাটাকে খুলে, চাবির ঘাটগুলো টিপে টিপে দেখছে। তারপর আবার ঢাকনাটা লাগিয়ে পাম্প করছে, ভোঁ করে ধরে রাখছে চাবিটা। ও ওটা শেষ না করে আমাদের সঙ্গে আর কথা বলবে না। রিয়াকে বরাবরের মতই কৌতুকময় আর নিবিষ্ট দেখাচ্ছে। সরস্বতীর ছবি দেখা শেষ করে ও একমাত্র কাচের শোকেসে রাখা যন্ত্রপাতি দেখছে। একখানা ট্রাম্পেট, গোটা দুই কর্নেট, একটা পারকার্সন, একটা জিপসি, একটা বেশ ছোট ঢোল, আর একটা প্রায় রঙ চটে যাওয়া বেহালা। এগুলো সব একটা শোকেসের তিনখানা তাকে রাখা। মনে হয় না এসবের অনেক ক্রেতা আছে। আর এগুলো এখানে বানানো হয় না। ঢোলের নিশ্চয় কারিগর আছে। পেছনের ভাঁড়ার ঘরটাতে কাঠের চাঁইগুলো দেখে তাই মনে হয়। ট্রাম্পেট, কর্নেট, বেহালা ইন্ডিয়া থেকেই আনানো নিশ্চয়। একবার মনে হলো জিজ্ঞেস করি। কিন্তু আমাকে নিয়ে কী ভাবছে ওস্তাদ তা মনে হতেই মনটা দমে গেল। ঘরভর্তি নানারকম আওয়াজ তখন, অথচ কী স্পষ্ট করে আপাত সুরহীন তার এই স্বরপরীক্ষা পষ্ট একটা দেয়াল তৈরি করেছে। সেই দেয়ালের মধ্যে কেবলমাত্র এই ওস্তাদ আর আমরা সকলে, এমনকি তার সাথী কারিগরেরা পর্যন্ত, দেয়ালের বাইরে উঁকিঝুঁকি মেরে তাকে দেখার চেষ্টা করছি। আমার ভীষণ অস্বস্তি হতে লাগল। অথচ এ নিয়ে এখন একটুও কথা বলতে পারব না। এমনকি রিয়ার সঙ্গেও।

দেয়ালে ঝোলানো সরস্বতীর ছবিখানা কোন এক ক্যালেন্ডারের পাতা কেটে বানানো। ছবিতে খুব অল্প সরস্বতী বেগুনি শাড়ি পড়েন। এই সরস্বতীও ঠিক বেগুনি শাড়ি পড়েননি। কিন্তু কীরকম একটা বেগনেটে আভা যেন তাঁর শাড়িতে আছে। আর তাঁর শাড়ির পাড় ঘন বেগুনি। হাতে যে বীণাখানা, আমরা জানি বলেই সেটা বীণা। নইলে ওটা তানপুরাও হতে পারত। সেটাতে সরস্বতীর হাতের যে ভঙ্গিমা, তা স্বপ্নের মত আলতো। এত আলতো যে মনে হয় বীণাটা বাজছে না বুঝি। কিন্তু পদপ্রান্তে যে রাজহংস গ্রীবা আর পাখনা প্রসারিত করে কী যেন এক অস্পষ্ট সমুখে যেতে চায়, তাতে বোঝা যায়, স্পষ্ট করে, যে বীণাটা বাজছে। আর দেবীর চোখ। সেই মুখমÉল ভেদ করে যাওয়া একজোড়া চোখও স্বাক্ষী বীণাটা বাজছে। হাঁসটার পিঠে বই থাকেই, সেটা বড় কোন বিষয় না। তবে একটা রহস্যময় জলের মধ্যে ততোধিক রহস্যময় একজোড়া আবীর গোলাপী ফুল ফুটে আছে। পদ্ম হওয়াই নিয়ম। সেই নীল জলরাশির মধ্যে বৃহদায়তন এক পদ্মের উপর বসে সুরমুর্ছনা তুলছেন যে দেবী সরস্বতী, তাঁকে ওই স্বর্গরাজ্য থেকে অপসারণ আর সম্ভব নয়। এই সমস্ত ঘরের মধ্যে সেই এক নিজের রাজ্য সুরদেবীর। এইসব ছবির আঁকিয়েরা, নগরের অচেনা পটুয়ারা, আমার চিরকালের বিস্ময়।

ওস্তাদের হাতে হারমোনিয়ামের ঘাটগুলো ভোঁ ভোঁ আওয়াজ কমিয়ে দিয়েছে। বুঝতে পারছিলাম তাঁর কাজ শেষ। শেষে তিনি যখন আবার রামপ্রসাদী সুর বাজাতে শুরু করলেন তখন টাকা বের করতে আমি পকেটে হাত দিয়েছি।

"... মনরে কৃষি কাজ জান না
এমন মানবজমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা..."

এবারে আমার অস্বস্তির উপর তিনি সুবিচার করলেন। কিংবা আমি আত্মগোপন করেছি এই বোঝাবুঝিতে তাঁর সেই নিস্পৃহ অভিমানে বুঁদ থেকেই গেলেন। বোঝা কঠিন। হারমোনিয়ামের কাঠের শরীরে শেষদফা কয়েক প্রস্থ টোকা মারতে মারতে ওস্তাদ কথা বললেন আবার—

'যাত্রা পাট্টিতে আমি বহু হারমোনিয়াম দিয়েছি। বহু কীর্তন পাট্টিতে হারমোনিয়াম দিয়েছি। খোঁজ নিয়ে দেখবেন। এক শ'র উপরে ওস্তাদ। আপনারে ভাল জিনিস দিলাম। মন দিয়া বাজাবেন।'

এই কথাগুলো বললেন তিনি হারমোনিয়ামটার দিকে তাকিয়েই। তারপর মেঝে থেকে মুখ তুলে তাকালেন আমার মুখের দিকে।

'এইটাও একটা কীর্তন দলের হারমোনিয়াম ছিল ওস্তাদ। পয়সায় টান পড়ল যখন, জুড়ি একটা রেখে এইটা আমার কাছে বিক্রি করে গেছে। যে দামে আমি কিনেছি আপনার কাছ থেকে তার থেকে তেমন বেশি নিলাম না। আপনি ২০০০ দেবেন। আমার কেনা না হলে আমি আপনাকে এমনি এমনি দিয়ে দিতাম।'

'তা দেবেন কেন? আমি তো কিনতেই এসেছি। আর আপনিও তো হারমোনিয়াম বেচেন।'

আমি না বলে পারলাম না। তিনি এবারে হেসে ফেললেন। সেই হাসিতে কী মাখানো ছিল তা তিনিই ভাল বলতে পারবেন। কিন্তু সেই হাসির প্রত্যুত্তরে আমি হাসতে পারলাম না।

'আমিও তো বেচলামই আপনার কাছে। আমি তো হারমোনিয়াম বেচতেই বসেছি। আপনার কাছেও তো বেচলামই।'

তিনি হাসতেই থাকলেন। সেই হাসিতে বিব্রত হতে হতে আমি পকেট থেকে আলাদা করে রাখা ২০০০ টাকা বের করে দিলাম। তিনি হাত বাড়িয়ে বসতে পারেন এই ভয়ে যে হারমোনিয়ামটা আমরা এক্ষুনি কিনলাম, তাঁর কোলের কাছে থাকা সেই হারমোনিয়ামের ঢাকনার উপর টাকাগুলো দিলাম। তিনি হাসতেই থাকলেন। আর আমি জানালাম আমরা শাঁখারী বাজারে ঘোরাঘুরি সেরে হারমোনিয়ামটা নিয়ে যেতে চাই। ওস্তাদ হাসি থামালেন। একবার রিয়াকে দেখে নিলেন। এই খÉ চলমান ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে নিরুত্তাল ও। ওর দিকে না তাকিয়েই আমি তা জানি।

'ভেতরে নামকীর্তন চলছে। মাইকে বাজছে। শুনতে পেয়েছেন?' আমি মাথা নাড়ি। শাঁখারী বাজারের নিবিড় ব্যস্ত শব্দরাজ্যেও কীর্তনের শব্দ আমি শুনছিলাম। আর সেখানেই যাব ভাবছিলাম। ভাবছিলাম রিয়াকে সে কথাই বলব। আর রিয়াই এতকিছুর মধ্যে পষ্ট করে বলল—

'আমরা ওখানেই যাচ্ছি।'

ওস্তাদ রিয়ার দিকে চেয়ে পরিষ্কার হাসল। এই এতক্ষণে ওস্তাদের হাসি আমার একদম সাফ মনে হলো। এই স্বচ্ছ হাসি আমি একবারও তাঁর মুখে দেখিনি। আমি আরো কুঁকড়ে গেলাম। দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে বিস্তৃত আমার দ্বিধা আবার আমাকে পিছিয়ে নিয়ে আসে। ঘরের মধ্যে ঢুকে আমি ওস্তাদকে বলি—

'ওস্তাদ আমার দুইটা আলাপ আছে।'

হাসি সরিয়ে নিয়ে মাথা দুদিকে দোলান ওস্তাদ। তাঁর ঘাড়ের চুল আন্দোলিত হয়।

'বলেন।'

'ওস্তাদ আমি ওস্তাদ না। কোন যাত্রা পাট্টি করি না। কোন কীর্তন পাট্টিও না। আমি খুব লজ্জা পেয়েছি আপনার কথায়। আমি মাষ্টারি করি।'

'আমিও তো তাই বলেছি।'

'না না আমি যাত্রা দলের মাস্টার না। আমি কলেজে মাষ্টারি করি। আমার কলিগের জন্য হারমোনিয়াম কিনতে এসেছি।'

এ কথায় ওস্তাদের যে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ হলো তা না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সরু চোখে রিয়া দেখছে আমাদের। ওর মুখের কোথাও আর কৌতুক নেই। আমি বেশ বুঝতে পারি কলেজ মাষ্টার আর যাত্রাদলের মাষ্টারের সীমানায় অনিশ্চিত যাতায়াতের কোথাও ও নেই। এই প্রান্ত সীমানাগুলো ওর আরো ভাল করে চেনা। তাই ওর কোন অস্পষ্ট বসবাস নয়। ওস্তাদ আমাকে এই বিভ্রান্ত ভাবনাতেও সময় কাটাতে দেন না।

‘আর কী বলবেন?’

‘আপনি যাত্রা পাট্টি আর কীর্তন পাট্টির কথা এমনভাবে বললেন...মনে হয় আপনি দুইটাকে একই রকম দেখেন।’

‘দুই পাট্টিই আমার কাছ থেকে হারমোনিয়াম নেয়।’

‘কিন্তু সেটা তো কথা না।’

‘কী কথা তাইলে?’

‘কীর্তনের পাট্টি আর যাত্রা পাট্টি এক কথা হলো?’

‘এক না। আবার একও। আপনি ওস্তাদ মানুষ। আপনার তো বোঝার কথা।’

‘সেজন্যেই তো বলছি আমি ওস্তাদ না।’

‘ওস্তাদ, আমি আপনাকে কী বোঝাব? দুই পাট্টিই বাড়ি থেকে যায়। গেরস্থের সঙ্গে এদের জীবনের কোন মিল নাই ওস্তাদ। যাওয়াটা আসল। আমি বোঝাতে পারি না। বুঝতে পারি। আপনিও বুঝবেন ওস্তাদ।’

‘আমরা হারমোনিয়ামটা নেওয়ার সময় একটা রামপ্রসাদী শোনাবেন?’

আমি খানিক সময় নিয়ে এই কথাটাই বলি তাঁকে। তিনিও সময় নেন উত্তর দিতে। তারপর বলেন এরপর আরেকদিন যখন আসব তখন শোনাবেন। তিনি আমার গানও শুনবেন। মেঝের দিকে তাকিয়ে আত্মস্থ স্বরে ওস্তাদ বলেন। আরেকবার অনুরোধের সাহস আমার হয় না।

‘হারমোনিয়ামটা যত্ন করে রাখেন ওস্তাদ। এইটা আমার খুব প্রিয় হারমোনিয়াম। বিরাট কীর্তনিয়ার হারমোনিয়াম এইটা। সে রাখতে পারে নাই। হারমোনিয়ামটাতে হাত দিলে আপনার গলায়ও কীর্তন আসবে।’

‘ওস্তাদ আপনি পাট্টিতে নাই কেন?’ আমি জিজ্ঞেস করি।

এবারে ওস্তাদ ঘর কাঁপিয়ে হাসেন। ঘাড়ের চুল দুলতে থাকে তাঁর মাথার দুলুনিতে। উঠে দাঁড়িয়ে পাশের ভাঁড়ার ঘরে যেতে যেতে বলেন—

‘ভাল কথা জিজ্ঞাস করছেন ওস্তাদ। আমি পাট্টিতে নাই। মন তো আমার পাট্টিতেই পড়ে আছে। কঠিন সংগ্রাম ওস্তাদ। আয়পাত্তির ঠিক নাই। কন্টাক্ট নাই। যাত্রায় তো আজকাল পালার কদরও নাই। হারমোনিয়াম বানিয়ে তো দুচার পয়সা আসে।’

পাশের ঘরে ঢুকে ঘাড় ঘুরিয়ে আবার—

‘আবার পাট্টিতে যাব ওস্তাদ। বললাম না পরের বার গান শোনাব। গান নিয়াই আছি এখন।’

বিভ্রান্তভাবেই আমি রাস্তায় রিয়ার পাশে আসি। এই আমার ব্রাত্য চেহারা, ব্রাত্য অবয়ব আর আটপৌরে পোশাক, আছাটা চুলদাড়ি নিয়ে বরাবর গর্বিত ছিলাম। আমার মনে হতো আমি চারপাশে প্রোথিত থাকি। আজ এক লহমায় সুরটা কেটে গেল কোথায়। আর আমি ভোঁতা একটা গ্লানি সমেত থাকি। অনেকক্ষণ আমরা কথা বলি না। লাটাই আর ঘুড়ি কিনি, জরি কিনি, চুমকি কিনি, চুড়ি আর শাঁখা কিনি, আগরবাতি কিনি। যা কিছু শাঁখারীবাজারের, কিনতে থাকি আমরা। তারপর দুই রাস্তা পরে লোকারণ্য নামকীর্তনের মÉপে চলে আসি। রমজানের দ্বিতীয় সপ্তাহ। অষ্টপ্রহর নামকীর্তন চলছে।

আমরা যখন মÉপে তখন হলুদ ফতুয়া-পরা অল্পবয়সীদের একটা দল গান গাইছে। আমরা মÉপের পেছন দিক থেকে আসছিলাম। একদম সম্মুখে বসা একদল মহিলা তখন চোখ মুছছেন। গাইয়েদের একজন, ২০-২২ বছরের একটা ছেলে একজন বয়জ্যেষ্ঠাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, আর সেই মহিলাও গলা-ছেড়ে কাঁদতে শুরু করলেন। এই ছেলেটি কিংবা এই মা কোন গাঁয়ের আমাদের আর জানা হলো না। কেনই বা নামকীর্তন গাইতে এসে, শুনতে এসে মানুষে কাঁদে তাও খুব জটিল ব্যাপার। সেই ঠিকানাবিহীন কান্নার সামনে সুস্থির হয়ে থাকা কঠিন। অনেকক্ষণ ধরে আমরা এটা সেটা কিনেছি, ভরপুর ছিলাম। কিন্তু কথা বলা হচ্ছিল না। আমি রিয়ার সঙ্গে কথা বলার জন্য নিশপিশ করতে থাকলাম। কীর্তনের সুর কথাগুলো ছাপিয়ে আমাদের কানে ঢেউ খেলাচ্ছে। আর সম্মুখের দৃশ্যরাজি, সেই লোকারণ্য একটা

অবধারিত অংশ হয়ে আমাদের আঠার মত সেঁটে রেখেছে। আমি রিয়ার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াই।

'রিয়া হারমোনিয়ামওয়ালার সামনে আমি না হেঁট হয়ে থাকলাম। আমি বুঝতে পারছি না...'

'ক্ষমতার দেয়াল অনেক পোক্ত।' রিয়া বরাবরের মত তীক্ষ্ণ।

'কিন্তু আমি তো ব্রাত্য পরিচয়ে গর্বিত হই।'

'সেটা অন্য জিনিস। ধারণ তো আর করতে হয় না। আজকে একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেছ।'

'তাই হবে।' আমি আবার রিয়াকে ডেকে কথা বলি।

'আর এই যে গাইয়ে কাঁদছে আর শ্রোতাও কাঁদছে ... কী বুঝবো বলতো! কীসের কান্না এটা!'

আমি স্বগতোক্তির মত বলি। কিন্তু রিয়া স্বগতোক্তি করে না।

'আমরা ভক্তিও বুঝি না। বাস্তুচ্যুতিও বুঝি না।'

সেদিন ফেরার পথে হারমোনিয়ামটা আমরা নিয়ে এসেছিলাম। আর বছর দুয়েকের মাথায়, হারমোনিয়াম ও গান বিষয়ক উত্তেজনা শেষ হলে, আমাদের কলিগ তাঁর হারমোনিয়াম বিক্রিও করে দেন। ও অংশটা ওখানেই শেষ।

এরপর, বহুদিন পর, বহুবছর পর, ধামরাইয়ের লোকাল গাড়িতে চড়তে গিয়ে যে লোকটাকে পেছনের দিকে দেখলাম, চোখাচোখি হলো, তাকে আমার চেনা চেনা লাগল। ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আরেকবার সে কথা মনে পড়ল না। সাভার ছাড়িয়ে যখন গাড়ি ঢাকার পথে তখন বড় গলায় পেছন থেকে কেউ ডাকল 'ওস্তা-আ-আদ!' চমকে উঠে লম্বা চুলের লোকটিকে আমি ঠিকই চিনতে পারলাম।

'ওস্তাদ! এই পথে!'

'আপনি এইখানে কী করেন?'

'আমি মাষ্টারি করে বাসায় যাই।'

'ওস্তাদ-ই আছেন তাইলে।'

'কী যে লজ্জা দেন ওস্তাদ। আমি আর কী করে খাব! তা আপনি কী হারমোনিয়ামের ডেলিভারি দিতে গেছিলেন?'

আমরা ততক্ষণে দুজনেই দাঁড়িয়ে আছি, ভিড় ঠেলে, পাশাপাশি।

'না ওস্তাদ। হারমোনিয়াম তো ডেলিভারি দিই না।' ওস্তাদ বলেন। ওস্তাদের মত শোনায় না কিন্তু।

'মানে! তো গানেই ঢুকলেন আবার?'

'আসলেন না তো শুনতে। বলছিলেন কিন্তু একবার গান শুনতে আসবেন।'

'হ্যাঁ মানে ওই নানা ব্যস্ততায়...'

'ঠিক আছে সমস্যা নাই। তিন বছরের মধ্যে আসলে দেখা হতো।'

'কেন দোকান তুলে দিলেন?'

'আর কী করব? কয়টা দোকানে আর হারমোনিয়াম বিক্রি হয়? তাও শাঁখারী বাজারে। অন্য কিছু করাই লাগত।'

'কিন্তু আপনার তো ইচ্ছা ছিল একটু গুছিয়ে আবার পাট্টি দেবেন। তো সেটা তাহলে...এখন কী করেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ পাট্টিই দিলাম...'

বাসের সবার কান কাঁপিয়ে কেমন যেন হাসেন ওস্তাদ।

'...সেই গানই আবার।'

'গান গেয়েই চলে? মানে সেই পাট্টিতেই...কী পাট্টি?'

'স্যালাইন আর পোলিও টীকার পাট্টি।' আবার বাস কাঁপিয়ে অন্তর্গত এক হাসি হাসেন ওস্তাদ।

'স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে?'

'আমরাই তো...কোন সমস্যা নাই। নতুন চকচকা হারমোনিয়াম, জুড়ি, একটা কর্নেটও আছে, সঙ্গে নাল। গায়ে দেবার জন্য সুন্দর হলুদ জামা আর সিল্কের লুঙ্গিও দিয়েছে।'

হাতের পুঁটলিটা আমার নাকের সামনে এনে ধরলেন।

'আমি বাসায় এই জামা পরে যাই না।'

এ দফায় মেঝের দিকে, বাসের, তাকিয়ে থাকি আমি। ওস্তাদের কাঁধে চুলগুলো দুলছে কিনা বুঝতে পারি না। কিন্তু আমার মুখের দিকে তিনি চেয়ে আছেন তা বুঝতে পারি। আমি গাবতলী অন্তত আসা

পর্যন্ত প্রহর গুণতে থাকি। প্রায় গুছিয়েও এনেছিলাম। আর মিনিট চার পাঁচেক বড়জোর। ওস্তাদ আমার বাম হাতে আলতো হাত রেখে বললেন, খুবই বিব্রত আর বিপর্যস্ত স্বরে—

'ওস্তাদ একটা কথা বলব?...হারমোনিয়ামটা আমার আসলেই খুব প্রিয় ছিল। আপনার তো আর লাগেও না বোধহয়। আমাকে দিয়ে দেবেন? না না আমি কিনেই নেব। দুটা মাস হয়তো দেরি হবে টাকাটা দিতে। আমার জন্য এইটা আপনি করবেন। কয়দিন যে আপনাকে মনে মনে খুঁজছি...আমার একা একা কীর্তন গাওয়ার ইচ্ছা হয়।'

পাখিসংক্রান্ত একটা গল্প

মোড়ের কাছটাতে সাইকেল ঘোরাতেই কোথাও তীক্ষ্ণ একটা দোয়েল ডেকে বসে। হতে পারে সজনে ডালে। আমার ইচ্ছে হয় তাকে দেখি। কিন্তু সাইকেল চেপে সেটা সুবিধে হচ্ছে না। আমার মতিগতি বুঝতে পেরে সেটা আরেকবার ডেকে দেয়। 'চালিয়ে যাও বান্ধব, এখন আমাকে না দেখলেও চলবে।' ফলে আমি এগিয়ে যাই।

দোয়েলদের ডাকাডাকি আমি খুব চিনি। আগে চিনতাম না। তখন টুনটুনিদের সঙ্গে আমি আকছার গুলিয়ে ফেলতাম তেমন কোনো কারণ ছাড়াই। এরা কেউই তো লুকোচুরি খেলা ছাড়া ডাকাডাকি করে না। পাতার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে লুকিয়ে, এ ডালে ও ডালে লাফালাফি করতে করতে ডাকে। আবার যে গাছে দোয়েলরা লাফায়, সে গাছে টুনটুনিরাও লাফায়। সে তুলনায় শালিকের বিচরণ, এমনকি ডাকাডাকিও, অনেক প্রকাশ্য।

দোয়েলটা যখন দ্বিতীয়বার আমায় ছাড়পত্র দেয়, তখনই আমি জানতাম। হলোও তাই। মোড়টা ছাড়িয়ে ডানহাতে পুঁটুশের ঝোপ দিয়ে বেড়া, আর তাতে বেগুনী, গোলাপী, সাদাটে ঘন থোকার পুঁটুশের ফুল। মৌসুমী মৌমাছিদের নিত্যনৈমিত্তিক সফর। মানুষেরা সেই ফুল ছুঁয়েও দেখে না। কেবল গরিব ঘরের অত্যুৎসাহী বাচ্চারা মৌমাছিদের দেখতে দেখতে জেনে যায় ফুলেদের ঘন ঐক্যের বোঁটার কাছে এক ছিটে মধু থাকে। খসখসে পুষ্ট পাতা আর কাঁটা মাখা শরীরের কোনো বাধাই ওদের বাধা নয়। ওরা ঠিকই মৌমাছির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেই মধুতে ভাগ বসায়। মৌমাছিরা এতে খুশি হয় বলে মনে হয় না। বোঁ বোঁ বোঁ। একনাগাড় মাথার উপর ঘুরপাক খায়। আর সেই বাচ্চাদের খিলখিল হাসি। এই রকম চলতে থাকে। সবসময় চলে না। দোয়েলরা যখন সজনে গাছে লাফালাফি করবার প্রস্তুতি নেয়, আর যখন সজনে গাছে কয়েক মাসের পুষ্ট সবুজ পাতারা একটি দুটি ফুলের বার্তা জানায়, তখন পুঁটুশে বেগুনী গোলাপী সাদার মহোৎসব চলে। বেগুনী, গোলাপী, সাদা, সাদাটে

গোলাপী, বেগনেটে সাদা, গোলাপী মাখা বেগুনী—রঙের এক রহস্যময় ডাকাডাকি। সেই বেড়াটা যেখানে শেষ হয় সেখানেই পুরনো ইটের একখানা সিংহদরজা। নামেই সিংহ। দরজাটা যে ভেঙে পড়েনি সেটা দীর্ঘকালের কৃতজ্ঞতার কারণে হতে পারে। এর ঠিক পেছনেই লাল, আর সারাটা বছরই বৃষ্টিতে ভিজে থাকা সোঁদা মাখা, শ্যাওলা মাখা ইটের যে বাড়িটা দেখা যায় সেটার সঙ্গে এই দরজাটার সম্পর্ক বহুকাল সহবাসের। দরজার একার পক্ষে সেখান থেকে বিদায় নিতে চাওয়া বড় বেমানান, অকৃতজ্ঞ। কিন্তু এতে কোনো বড়সড় সমস্যা হয় না। দরজার যে কাজ সেটা সে অম্লান এত বছর করেই যায়। বিদায় আর আগমনের হিসেব কষে রাখা, পাহারা দিয়ে রাখা। কিংবা যাওয়া আর আসার যে লঘুতা দরজা তাকে মাহাত্ম্য দিয়ে দেয়। আর সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে নীহারিকা। নীহারিকা ঘোষ। দোয়েলটা যে বার্তা আমাকে আগেই দিয়েছে।

এসব বহুকাল আগেকার কথা। কতকাল? তা তো মনে নেই। কালের হিসাব তখনই সম্ভব যখন আমি আকালের মধ্যে বসবাস করি। কিন্তু আমি তো আকালের মধ্যে নেই, থাকি না, সাধও হয় না যে থাকি। তবে এসব গল্পের কালবিচারের কিছু সংকেত আমি জানি। ঠিক ততকাল আগেকার কথা যখন সাইকেল, আর রাস্তা, সজনে গাছ আর দোয়েল, পুঁটুশ আর টুনটুনি, আর রাস্তার পাশে নিকেশকারী সিংহদরজা, তার মুখের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা নীহারিকা ঘোষ—ইত্যাকার আয়োজন আমার দৈনন্দিন, নৈমিত্তিক প্রহরের অংশ। আমার অভ্যাসের যাত্রাপথের সঙ্গী, অথচ এতটুকু অনাদরের নয় কখনো – প্রতিদিন, অথচ অপরূপ। তখনকার গল্প।

নীহারিকা ঘোষ। ও বলত এই নাম নিয়ে বনলতা সেনের মত কবিতা হতে পারত, এখনো পারে। আর হাসত। বলত—

'এখন কে বোঝাবে জীবনানন্দকে!'

'তুমিই গিয়ে বোঝাও।'

'অবশ্যই বোঝাতাম। তোমাদের মত ইন্টেলেকচুয়ালদের খপ্পর থেকে তাঁকে যদি পেতাম আদৌ।'

এসব কথায় আমার বোধহয় রাগই হয়ে যেত। জীবনানন্দকে নিয়ে খোঁচাত বলে নাকি ইন্টেলেকচুয়াল বলে কটাক্ষ করত বলে সেকথা আর এতদিন পরে মনে নেই। কিন্তু এতকিছুর মধ্যেও বনলতার সঙ্গে ওর নিজের এই তুলনায় খচখচই লাগত কেমন জানি।

'কিন্তু কবিতাটা তো একটা কালজয়ী কবিতা, সেটা তো মানবে!' আমি ভ্যাবদামারা গলায় অনিশ্চিত বলতাম।

'আরেকটাও হতে পারে। নাকি আবার তোমাদের দুইটাতে জাত যায়। কালজয়ী কবিতা, তাও আবার প্রেমের, সে একটা হলেই ভাল। চরিত্র ঠিক থাকে। কী বল!'

চোখ আর ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলত নীহার। তাও পুরোটা বলতে পারত না। শেষ করার আগেই ঝলমলানো হাসিতে নুয়ে যেত।

'আহা তা কেন! কত কবিতাই তো কালজয়ী আছে।'

'তাহলে তো হলোই। আরেকটা না হয় বাড়বে।'

'কে লিখবে?' ওকে সামলাতে হিমসিম খাওয়া আমি জিজ্ঞেস করতাম, বোকা বোকা গলায়।

'তুমিই লেখো না। কেউ তো মানা করেনি।' আবার হাসি নীহারিকার।

সিংহদরজার সামনেই, সেখানেও এই ছিল নীহারিকা। ওর সামনে সংশয়েই কাটত আমার। সারাটা সময়ই আমার অস্বস্তিতে বুক ধড়ফড় করত। কোনো কথাতেই নীহারিকার সঙ্গে জুৎ করা যায় না। একেক সময় আমি সিদ্ধান্তে চলে আসতাম প্রধান সমস্যাটা হলো ওর লঘুতা। এই আমি গুরুভাবে তখন আরো কাতর হয়ে পড়তাম। 'নাহ, ওর সঙ্গে আর এই যোগাযোগটা রাখা যাবে না।' নিজের গুরুতর অস্তিত্বটা কেন এরকম করে ওর সামনে জলাঞ্জলি দিই সেটা ভাবতে গিয়ে একটা ঘোঁট পাকানো রাগ নিয়ে বাড়ি ফিরি। কিন্তু সেও কেবল ঐ বাড়ি ফেরা পর্যন্তই। রাস্তায় যেটুকু সময় সাইকেলে থাকি সেই পর্যন্তই। মাঝে মাঝে প্যাডেলটা জোরে ঠেলি—ঐ পর্যন্তই। নইলে, রাতে যেই না পড়ার টেবিলে পড়তে বসতে হতোই, তখনই তো বিশ্রী লাগতে শুরু করত। মনে হতো 'কিন্তু কাল যদি নীহার দরজায় না থাকে!' না থাকলেও সমস্যা নেই।

মানে তাহলে আমারই সাইকেল থেকে নেমে ওদের হেলে পড়া সিংহদরজায় দাঁড়িয়ে ডাকা হবে—'মাসীমা! নীহার কি আছে?' আর যদি নীহার বাসায় না থাকে, আমিই সবচে ভাল জানি না দেখা হবার ঐ একটি দিন আমাকে জ্বরের মত পোড়াবে। আর পরের দিনটা কিছুতেই আসতে চাইবে না।

প্রথম দিকে মাসীমা খানিক গম্ভীর হয়ে যেতেন। আমি ব্যাপারটা বুঝতাম। কিন্তু আমলে আনতাম না। তারপর একদিন ওদের বাসাতেই চা খেতে খেতে নীহার কথাটা বলল। ওর সেই হাসি।

'মা জিজ্ঞেস করছিল তুমি আমায় নাম ধরে ডাকো কেন?'

'কী বললে?'

'বললাম আমিই তো বলেছি ডাকতে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী! মা খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর ও বলে চলে গেল।'

আবার সেই হাসি নীহারের। আর আমি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গোঁজ মেরে বসে থাকলাম। আমার দিকে দেখে নীহার বোধহয় কৌতুকই বোধ করল।

'কী উত্তর তোমার পছন্দ হয়নি এইতো!'

'আরে না না। আমি ভাবছি এরকম করে উত্তর আসে কীভাবে তোমার। আমি হলে একটা আলোচনায় বসে যেতাম। কেন এসবে কিছু আসে যায় না এসব বোঝাতে বসতাম।'

'তোমরা আলোচনা পারো। আমি বাপু আলোচনা পারি না, করিও না।'

নীহারের স্পষ্ট বিদ্রুপে আমার মাথায় সেই রাগটা চলে এল প্রায়। সাথে সাথে একটা রাস্তা পেয়ে সামলে উঠি—

'আচ্ছা! মাসীমা কথা বাড়াননি বলে তুমি পার পেয়ে গেছ। যদি আরো কথা চালাতেন!'

'এত সোজা না। আমিও হাসতে হাসতে বলে দিতাম—এটা কোনো ব্যাপার মা? তুমি হারুকাকাকে হারু ডাকো না?'

'হারু কে?'

'হারু কে মানে? আমাদের গরুর দেখাশোনা করে না ওরা?'

'ও হারাণদা!'

'হারাণকাকাও তো মার থেকে কত বড়। সেই তুলনায় তুমি আমার তেমন কিছু ছোট না। নাকি খোকাবাবুই থাকতে চাও? চাইতেও পার। তবে কিনা সবসময়ে সেটা বিশেষ সুবিধার না।'

নাহ্! অসম্ভব। এই শুরু হলো আবার। নীহারের লঘুতা অসহনীয় এক বিপন্নতা নিয়ে আসে আমার। ও বোধহয় সেটা বোঝেই না। ও হাসতেই থাকে। কিংবা হয়তো ও বোঝে বলেই আরো স্পষ্ট করে হাসে। আমার এই বিপন্নতাতে তাড়িয়ে তাড়িয়ে মজা পেতে থাকে ও। মাঝে মাঝে মনে হয় এই মজা পাওয়াটাই ওর জীবনের লক্ষ্য।

হারাণ যে ঠিক কবে প্রথম নীহারদের বাড়ি ঢুকেছিল সেটা বড়জোর হারাণ নিজেই বলতে পারবে। নীহারের বাবাও তখন ছোট। হারাণ ঢুকেছিল হারাণের বাবার সাথে। বাড়িভর্তি গরু তখন ওদের। সকালে এসে গরুর গোয়ালের কাজকর্ম সেরে দুধ দোয়াতে বসত হারাণের বাবা। নীহারের বাবা বলছিলেন তিনি দেখেছেন হারাণ প্রথম প্রথম বাবার কাছ থেকে একটা দুটো গরুর দায়িত্ব নিত। কাঁচা হাতে দুধ দোয়াতে গিয়ে বালতির বাইরে ফেলে দিত হারাণ। সেই হারাণ, নীহারের বাবার থেকেও বৃদ্ধ, হাসিমাখা মুখে এখনো সেই একই কাজ করে। যেন জন্মান্তরের চুক্তি। অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। নাহলে নীহারদের বাড়িতে এখন এমনকিছু গরু নেই যে হারাণের এই কাজের বিশেষ দরকার আছে। নিশ্চয়ই হারাণ এমন কিছু এখান থেকে পায়ও না। আমার কখনোই জিজ্ঞেস করা হয়নি হারাণকে কীভাবে চলে ওর। এমনকি সাধনকেও না। হারাণের ছেলে, যার সঙ্গে আমার আরেকটু বেশি দেখা হয়। হারাণের বদলে তখন প্রায়ই সাধন আসে নীহারদের বাড়িতে।

আমার প্রায়ই সাধনকে মনে হতো পুরাণের কচ। খামকাই হয়তো মনে হতো। গুরুগৃহে গবাদিপশু লালন পালন করে চলেছে। আর কোথায় একটা ভরকেন্দ্র দিয়ে মাপছে দেবযানীকে। আর নিজের ব্রত-কর্তব্য বিষয়ে অবিচল। কিন্তু নীহারের সামনে কখনোই সেকথা বলা হয় না।

এমনিতে ওর লঘুতা নিয়ে আমার যতই রাগ হোক না কেন এই কচ বিষয়ক আলাপ তুললে ও নিশ্চিত খুশি হবে না। ওর ভাল লাগবে না যে আমি সাধনকে নিয়ে ঠাট্টা করছি। হতে পারে সাধনকে ও অনেক বেশি বোঝে। অথচ সাধনকে নিয়ে মাথা ঘামাই অনেক বেশি আমি।

কতক দিন নীহারদের বাসায় সন্ধ্যাবেলা আমরা গানের আসরে বসি। রোজদিনকার মতো সেদিনও যে সাধনই মৃদঙ্গ বাজাবে সেটা জানা কথা। আর সেটা যদি বাবু ভাই বাজানও, সাধন নিশ্চিত বাজাবে মন্দিরা। কিন্তু তাও তো বাবু ভাই থাকা লাগবে। আমি তবু প্রায় দিনই জিজ্ঞেস করে বসতাম মৃদঙ্গ বাজাবে কে?

'কেন? সাধন!'

'ও হ্যাঁ তাইতো। সাধন তো আছেই।'

এরপরই কেবল সাধনের দিকে তাকিয়ে আমি একটা মিষ্টি-দেখতে হাসি দিতাম। আমার এখন মনে হয় এই হাসি আমি ঘরের ভিতর ঢুকে দিলেই পারতাম। সাধন প্রায়ই নরম চোখে তাকাত যখন আমি ওই প্রশ্ন করি—মৃদঙ্গ কে বাজাবে। মৃদঙ্গতে ওর কড়া-মিঠা চাঁটি প্রত্যেকটা আমার হৃৎপিণ্ডে এসে লাগত। এমনই হাত ওর যে সেখানে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। আমি তাকিয়েও থাকতাম। কিন্তু কখনো ওর বাজানো নিয়ে অনেক বড় গলায় কিছু বলেছি বলে আমার মনে পড়ে না। সাধন মৃদঙ্গ বাজায়। সাধন একটুও বালতির বাইরে না ফেলে গরুর দুধ দোয়। ওয়েল্ডিং-এর কারখানায় কাজ করে। আমি শুনেছি সাধনের বানানো জানালার গ্রিল লোকজন পছন্দ করে। কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে একটা পাশও করে রেখেছে আমার থেকে আগেই। আমি অবাক হব না যদি এতকিছুর মধ্যে কোনোদিন ডিগ্রি পরীক্ষাতেও পাশ করে ফেলে। সাধন চুপচাপ। এবং ও একটা বিস্ময়।

ওর ওই গভীর কড়া-মিঠা চাঁটির দিকে সবচেয়ে মুগ্ধ তাকাত সম্ভবত দুজন। একজন নীহারের বাবা সতীশকাকা। যে দুয়েকটা দিন মিষ্টির দোকানের কাজ অন্যদের ওপর ছেড়ে দিতে তাঁর ইচ্ছে হতো সেই দিনগুলোতে তিনি এসে বসতেন। দুয়েকবার বললে লাজুক লাজুক হেসে তিনি খানদুই কীর্তন বা বাংলা টপ্পা শুনিয়েও দিতেন। আর বাকি সময়টা আমাদের দিকে তারিফ-করা-চোখে তাকিয়ে থাকতেন। কিন্তু তার থেকেও বেশি তাকাতেন সাধনের আঙ্গুলগুলোর দিকে। সতীশকাকা ছাড়া আর যে অমন মুগ্ধভাবে সাধনের দিকে তাকাত সে হচ্ছে হারাণদা, সতীশকাকারও যে হারাণদা। ডাকার সময় হারু ডাকলেও, আমি লক্ষ্য করেছি সতীশকাকা হারাণের প্রসঙ্গ আসলে বলেন 'হারাণদা'। সঙ্গীতের সাথে হারাণদার কী সম্পর্ক ছিল তা এই এতগুলো বছর পর, সম্ভাব্য অনুসন্ধানের যাবতীয় লুপ্তপ্রায় রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে, কেবল গ্লানিময় এক জিজ্ঞাসা মাত্র। আপাত অস্পষ্ট স্মৃতিতে মনে পড়ে শুধু সতীশকাকার গলায় পদাবলীতে দোহার তিনি হতেন। কিংবা মন্দিরা বাজাতেন। আর নীহার বলত 'হারাণকাকা ঝানু মাল এ লাইনে।'

'কী যে বল না গো মা।'

লাজুক হেসে হারাণদা প্রতিবাদ করতেন। আর কাছাকাছি সময়ে মাসীমা রেকাবিখানা এনে গম্ভীর গলায় ঘোষণা দিতেন—

'মিষ্টি খেয়ে নাও। তারপর চা খেয়ে আবার গান ধর।'

'মিষ্টি খেলে কি আর গান-টান হয়? গলা ধরে যায় না?'

বলতেন সতীশকাকা। কিন্তু রেকাবিখানা টেনে পয়লা মিষ্টিও নিতেন তিনিই। মুখ টিপে হাসত নীহার, নীহারের দুই ভাই। আমার এসব বেলায় টীপ্পনি কাটতেই বেশি ভাল লাগত।

'ময়রায় তাইলে মিষ্টি খায় কাকা।'

'ভেজাল ময়রায় সবই খায়। মিষ্টান্ন ভাণ্ডার চালানো আর ময়রাগিরি মেলা তফাৎ।'

নীহারের দাদা আর ছোটভাই বোধহয় ততক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলত। ওর দাদা তখন কলেজ টলেজ সেরে একটা স্টেশনারি দোকান চালায় আর সেখানে বসে বসে রাজ্যের বই পড়ে। ছোটটা পরিষ্কার। ইন্টারমিডিয়েট শেষ করবে আমার পরের বছরই। আর তারপর বিশ্ববিদ্যালয়। ব্যাস। মাঝেমধ্যে একআধবার সতীশকাকা আমার মনের মধ্যকার প্রশ্নটা ধরে ফেলেছিলেন। ডেকে বসাতেন যখন একা পেতেন।

‘শোন ব্যাপারটা শুধু বাপ-দাদার ব্যবসা চালানো না-চালানোর না। তুমি মনে কর ইচ্ছা থাকলিই নির্মল স্টেশনারি দোকান না চালিয়ি মিষ্টির দোকান চালাইতি পাইরত?’

‘তা ঠিক। আপনাদের তো গরুও তেমন নেই আর। শুনেছি মেলা গরু ছিল আপনাদের।’

‘ধুর বাপু। তুমি তো দেখি আসল ব্যাপারই বোঝ না। বাড়ির গরুর দুধ দিয়ি তো বাবার অর্ধেক মিষ্টিও হোতু না। দুধ তো আইসতো গ্রাম থেকি।’

‘হ্যাঁ। গরুতো গ্রামেও নেই আজকাল।’

‘গ্রামে নেই তো নেই! বাংলাদেশে কি মিষ্টি খাওয়া কইমি গিয়িছি নাকি?’

‘তাও তো ঠিক। তবে হিন্দুরা আর কয়টা মিষ্টির দোকান চালায়!’

‘তোমার মাথা! শোন, ময়রার মিষ্টি বানানুর নেশাও ছিল। এখন এইটা আর নেশার ব্যাপার না। এইটি আলাদা ব্যবসার হিসাব। সেইটা রেইখি এই ব্যবসায় থাইকতি হয়। আর তোমাকে বলি শোন। হিন্দুরা এখনো এইট্টি পার্সেন দোকানের কারিগর। মানে তারা কর্মচারি। মালিক না। সেইজন্যিই বলি ময়রাগিরিটা সোজা। দোকান চালানোটা কঠিন।’

সতীশকাকার দোকানের কারিগর আর বিক্রেতা কর্মচারিরা তখন তাকিয়ে থাকত আমাদের দিকে। আর আমি আমার জ্ঞানগর্ভ যুক্তি দিতে তখনো পিছপা হতাম না।

‘তো স্টেশনারি দোকানও তো তাহলে সমস্যা।’

‘এক কথা হোলু? কী যে তোমরা পড়ালেখা কর! এখন এস্টেশনারি দোকানের প্রয়োজনটা কি এক হোলু? এই সাধন আমাদের ও যদি ওয়েল্ডিং না করে অন্তত একটা এস্টেশনারি চায়লাতু, ওর মৃদঙ্গ বাজানোর কদর একটু বাড়তো কিনা বলো? মিষ্টির দোকান চালানোটা এখন আমাদের কঠিন রে বাপু। এটা হিন্দু-মুসলমানের থেইকিও জটিল।’

নীহারকে নিয়ে আমার ততদিনে কবিতা একখানা লেখা হয়ে গেছে। আর সেই কবিতাটার নাম দিয়েছি আমি ‘দোয়েল’। নীহারকে সুযোগ পেলেই আমি তখন দোয়েল নামে ডাকি। আর ও ডাকে আমাকে মাছরাঙা। অনেক দুর থেকেই জলের মধ্যে মাছ দেখতে পাই। তারপর ঝপাৎ করে ডুব দিয়ে ধরি। হাসতে হাসতে বলত ও। আমি কতবার যে তখন ‘দোয়েল’ কবিতাখানা বের করে পড়ি একা একা। সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসে। মাঝরাত্তিরে শুতে যাবার আগে। আর ক্লাশে যখন একেবারেই মন বসে না তখন অন্যদের চোখ এড়িয়ে খাতার মধ্যে লেখাখানা। এই এতকিছুর মধ্যেও যেদিন সাধন নীহারের জন্য একখানা চন্দনা পাখি নিয়ে এলো খাঁচায় ভরে, আমার মনের মধ্যে কোথায় যেন সুর কেটে গেল। সারাক্ষণ মনে হতে থাকল চন্দনার থেকে ভাল উপমা আর নীহারের হয়ই না। অথচ একটিবারও নীহারকে আমার বলা হলো না সে কথা।

ওদের আধশ্যাওলা বিরাট উঠোনে, বড়ই গাছের নিচে, খাঁচায় চঞ্চল বিষন্ন সেই পাখিকে আমি দেখেছিলাম। এমনিতে টিয়াই। কেবল মাথাটা বেগুনি। আর টিয়ার থেকে অনেক অস্থির আর চঞ্চল। আমি শুনেছিলাম চন্দনা ভীষণ অভিমানী পাখি। এতটাই যে বন্দি করা হয়েছে বুঝতে পারলে প্রথমে আরো অস্থির হয়ে বের হবার চেষ্টা করে। তারপর দরকার হলে আত্মাহুতি দেয়। মানে মরে যায়। ইচ্ছামৃত্যু! আমি শুনেছিলাম। আর সেকথা নীহারিকাকে বলেও ছিলাম। নীহারিকা স্পষ্ট করে হাসল। ও হয়তো জানত ওর হাতে চন্দনা মারা পড়বে না। সত্যি সত্যিই ছেড়ে দিল ও তিনদিন পরে। আর তারপরের অনেকগুলো দিন সেই চন্দনা বড়ই গাছে এসে বসত কেবল নীহারকে দেখবে বলে।

এরপর কখন যেন নীহারকে নিয়ে দোয়েল-বিষয়ক কবিতা লেখার কাল আমার কেটে গেছে। আমি তখন কলেজ-ব্যস্ত মানুষ। সাইকেলে আসা কিংবা যাওয়ার পথে কখনোই নীহারের সঙ্গে দেখা করতে নামা হয় না। আমার রাস্তাও তখন কীভাবে যেন বদলে গেছে। আর আমার মনেও পড়ে না রাস্তার ধারে নীহার দাঁড়িয়ে থাকতে

পারত কিনা। মনে পড়ল একদিন যেদিন সাইকেলে জুলিকে বসিয়ে আমি ওর বাসার পাশ দিয়ে যাচ্ছি। রাস্তায় সেদিনও পুঁটুশের ঝাড়। আর সজনে গাছে দোয়েল। আর আমার মনে পড়ল যখন হেলে-পড়া সিংহদরজায় নীহার দাঁড়িয়ে নেই।

ওরা ভারত চলে গেছিল হঠাৎ করে। আমার মা জানতেন। বোধহয় সেজন্যই বারকয় ওদের বাসায় যেতে বলছিলেন। এর থেকে বেশি বিশ্বাস আমার ওপর রাখার কোনো কারণ দেখেননি মা। আর আমি যাচ্ছি যাব করে কদিন কাটিয়ে দিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি হঠাৎ শেষ হলো যখন তড়িঘড়ি করে ঢাকায় এলাম। দুপুরে একদিন মা জিজ্ঞেস করলেন 'গেলি না বাবা নীহারদের বাসায়? ওরা তো আজ সকালে ইন্ডিয়া চলে গেল।'

একটুখানি লাগল বোধহয় আমার। নীহারের সঙ্গে আমার দেখা হবে না আর? কিন্তু সেরকম বোধহয় কোনো টানও লাগেনি। আর ঢাকায় ফিরে চারদিন পরে পেলাম নীহারের ডাক-চিঠি:

> "প্রিয় 'মাছরাঙা',
> মাছরাঙাই তো! নাকি তুমি আবার স্বনামে ফিরতে চাইবে? এত ভুলতে পার তুমি! কে যেন বলছিল তুমি এখানে এসেছ। ভাবলাম আমার কপাল। নিশ্চয়ই যাবার কালে দেখা হবে। বুঝলাম হবে না যখন যাবার আগের রাত্তিরেও এলে না। তারপর সাধনের হাতে এই চিঠি রেখে গেলাম।
>
> কতদিন আসো না তুমি এ পথে। সেটা আমার কোনো অভিযোগ না। কিন্তু আমি ভাবি এত ভুলতেও পারে মানুষ! একবারও তোমার মনে হয়নি রাস্তায় আমি দাঁড়াতে পারি? আমাদের জীবনের গতি নিশ্চয়ই দুইরকম। তুমি লাফিয়ে লাফিয়ে আরেক পথে যাও। আর আমি গড়িয়ে গড়িয়ে একপথে হাঁটি। একবার মনে হলো বহরমপুরে আমাদের ঠিকানা তোমায় দিয়ে দিই। আবার মনে হলো তোমার কি কখনো সময় হবে? কিংবা ইচ্ছা? আর সেরকম হলে নিশ্চয়ই তুমি খুঁজে নিতে পারবে। এর থেকে ঢের কষ্ট করে তুমি সজনের ডালের পাতায় দোয়েলের ল্যাজ দেখতে। দেখতে না?
>
> তোমার কবিতাখানা তোমার নতুন খাতায় আছে কিনা কে জানে। আমার জন্য সেটা জরুরিও না। কিন্তু কবিতাখানা আমি নিয়ে যাচ্ছি। আমার এখনো ওটার সঙ্গে সম্পর্ক বড় আপন। ওটাতে আমি কখনো বাঁধা পড়িনি বলেই বোধহয় আমার এখনো আপন আছে।
>
> লেখাপড়া আমরা তেমন করলাম না কেউই। মফস্বলের কলেজ পড়া আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অনেক তফাৎ। তুমি নিশ্চয় বড় চাকরি করবে। টিকে থাকার জন্য সেটা অনেক ভাল রাস্তা। একটা অনুরোধ আছে আমার। কখনো যদি সম্ভব হয় সাধনকে একটা ব্যবস্থা করে দিও। তুমি নিশ্চয় মানো ওর যোগ্যতা অনেক। অন্তত মৃদঙ্গ বাজানোটাও যদি ধরে রাখতে চায়, ওর একটা ভাল চাকরি দরকার। ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি হয়ে সেটা সম্ভব না।
>
> আর কখনো দেখা হবে এই ভরসা নেই আমার। কিন্তু তোমাকে আমি কখনোই ভুলব না। আগের তুমি। আর এখনকার তুমি—দুজনই।
>
> —ইতি
> 'দোয়েল'??"

সাহেবালির ঘোড়ারোগ

পলানের পরিসংখ্যান বিদ্যা

পরিসংখ্যান বিষয়ক পলানের আগ্রহ ধরা পড়ে হঠাৎ করেই। একেবারে হঠাৎ। বলা নেই কওয়া নেই একদিন স্কুল থেকে ফিরে বাসায় যা ছিল খেয়ে দেয়ে পলানের খেলতে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না একেবারেই। বরং সে স্কুলের বাংলা রুলটানা খাতার পরিত্যক্ত পৃষ্ঠাগুলো খুলে সাহিত্যচর্চায় মন দিল। স্কুল বলতে চাটাই দেয়া একখানা ঘর যেরকম অনেকগুলো ঘর বাংলাদেশের শহরে গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যে ঘরগুলো দেখতে প্রায়ই বিদেশ থেকে বিশালাকায় সাদা সাহেবরা আসে। এবং প্রায় প্রতিটা সফর শেষে তাদের বাহবার অন্ত থাকে না। শহরে গরিব পাড়ার লোকেরা তখন খুব আস্থার সঙ্গে বুঝতে পারে নিশ্চয়ই এই স্কুলঘরগুলো নিয়ে অনেক গর্ববোধ করা যায়। তারা খুশিমনে পরের বার আবার কবে সাহেবরা আসবে সেই অপেক্ষা করতে থাকে। আর গর্ব করে। পলানেরও ভারি গর্ব। এরকম একটা স্কুলে পড়তে পেরে গর্ব কিছুতেই ওর ছোট্ট বুকটাতে ধরে না। তাই বলে কখনো বাসায় এসে ঘরের মাটিতে হোগলায় বসে বুকে উবু হয়ে একমাত্র বলপেনটা হাতে নিয়ে সাহিত্যচর্চা করতেও সে বসে না।

সাহিত্যচর্চা বলা হলো বটে, কিন্তু পলান এসব লঘুচিত্ত বিষয়ে একেবারেই ভাবছে না তখন। ও একটা পরিসংখ্যান হাজির করতে ব্যস্ত। ও লিখল 'বাংলাদেশের তিনভাগের একভাগ লোক রিকশা চালায়, আর তিনভাগের একভাগ লোক বাসের কন্টাকটার, আর তিনভাগের একভাগ লোক পায়ে হাঁটে, আর তিনভাগের একভাগ লোক বাসে চড়ে যায়, তারপর তিনভাগের একভাগ লোক ঘোড়ার গাড়ি চালায়।...' এইরকম একটা দুরূহ পরিসংখ্যান পলান বার করল কীভাবে সেটা কাউকেই দুশ্চিন্তায় ফেলল না। বরং, তার পড়শিদের যে ক'জনা এই সমস্যাটা পলানের কাছ থেকে শুনেছে তারা সবাই গম্ভীরভাবেই শুনেছে। এবং বুঝেছে সমস্যাটার গুরুত্ব। সকলেই তারা পলানের বিচক্ষণতা নিয়ে গর্বিতও বটে। তখন আর কত বয়স ওর! এই তো সবে ফোর কি ফাইভে পড়ে। যাহোক, পরে জানা গেল পলানের স্কুলে তাকে যে-কোনো একটা জন্তু-জানোয়ারের উপর রচনা লিখতে দিয়েছিল। ফলে তার লেখাখানা ঘোড়া বিষয়ক রচনাও বটে। এবং, ঘটনাচক্রে, এদিন ঠিক সকালেই পলানের বাবা, সাহেবালি, একটা ঘোড়া কিনে পাড়ায় নিয়ে এসে হৈ চৈ বাধিয়ে ফেলেছিল। পলান যখন ওর সাহিত্যরচনা করছে তখন সেই ঘোড়াটা ওদের সকলের একসারি ঘরের ঠিক শেষ মাথায় একটা বালিফেলা জায়গায় দড়ি দিয়ে ভাবলেশহীন বাঁধা।

সাহেবালি

বলে না দিলে সাহেবালিকে পলানের বাবা বলে চেনা খুব মুস্কিল। যে পলান সেই ৯/১০ বছর বয়সেই দুরূহ সব পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করে, সিরিয়াস বিষয় নিয়ে পাড়া-প্রতিবেশিদের গম্ভীর বানিয়ে দেয় সেই পলানের বাবা কিনা প্রায় কারো কাছেই ঠিক পাত্তা-পাওয়া লোক না। মানে ঠিক কারোরই আশপাশে মনে হয় না যে সাহেবালিকে দিয়ে কোনো কাজের কাজ করানো সম্ভব। সে হচ্ছে সেইসব বিরল প্রজাতির মানুষ যারা ভাবতেই থাকে মাথায় ঘিলু থাকলে আজ না হোক কাল কিছু একটা হয়ে যাবে, এবং সেই সম্ভাব্য ফলাফলের আশায় লাগাতার কিছু না কিছু ঘিলুর-উদ্যোগ দু'চারদিন পরপরই নিতে থাকে। তার মেজাজ-মর্জি বোঝার জন্য অতি পরিচিত তার একখানা জবান শোনানোই যথেষ্ট—'দুর মিয়া! এইড্যা এড্ডা ব্যাপার অইল?' কথাটা সাহেবালি বলেও যথেষ্ট চেঁচিয়ে। কোনকিছুকেই একটা ব্যাপার হিসেবে পাত্তা না দিয়ে সাহেবালি জীবনটাকে সহজ বানাতে চাইছিল। যখন মহিলাদের বড়ি খাবার উপকারিতা নিয়ে একগাদা বক্তৃতা দিয়ে বেড়াল এনজিওর আপারা, প্রায় সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে এই বিদেশি মাল খেয়ে ঈমান নষ্ট হবে কিনা। সাহেবালি কিন্তু একটা দোকানে বসে প্রায় বিড়ি খেতে খেতে এক মিনিটে রায় দিয়ে দিয়েছে 'দুর মিয়া! এইড্যা এড্ডা ব্যাপার অইল? খাইলে কী অয়!' এরপর এত উৎসাহের সঙ্গে সে অফিস থেকে ৬ মাসের বড়ি নিয়ে এসেছিল, যে-কারো মনে হতে পারে সাহেবালি ওগুলো নিজেই খেয়ে ফেলতে চায়। সেজন্য বিলিকারী

আপা বারবার করে বলে দিল যাতে কিছুতেই সাহেবালি নিজে ওগুলো না খায়। কিংবা ভুলভাল খেয়ে ঝামেলা বাধালে কিন্তু তাদের আর কিছু করার থাকবে না। যাহোক, সাহেবালি অবশ্য এসে কলমিকেই ওগুলো দিয়েছিল। এবং খুব ভালমত বুঝিয়ে দিয়েছিল কীভাবে খেতে হবে। তখন পলানের বয়স ৫। আর ওর ছোটবোন পলির বয়স ১। এরপর যখন পোলিওর টীকা দিতে পাড়ায় আপারা এবং স্যারেরা আসে, পড়শিদের অনেকেই পলির নাম নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়ে যায়। সাহেবালি কিন্তু আবার 'দুর মিয়া! এইড্যা এড্ডা ব্যাপার অইল? শিক্ষিত লোকদের মাইয়্যাগো এই নাম কত দেখছি।' এরপর যখন ইট পড়ে ওর পা থেতলে গেল, পনেরো দিন কাজে যেতে পারেনি। প্রতিবেশিরা কিন্তু খুব আন্তরিকভাবেই দুঃখ পেয়েছে। সাহেবালি তখনো 'দুর মিয়া! এইড্যা এড্ডা ব্যাপার অইল? কাজ কইর‍্যা খাইতে গ্যালে এগুলা অয়ই, মোহাশিন যে পইর‍্যা মইর‍্যাই গেল।' এই কথাগুলো বলার সময় সেবার তার মুখটা একটু শুকনা ছিল এই যা। প্রতিবেশিরা সবাই মোহসীনের মৃত্যুর গুরুত্ব বুঝল কিংবা বুঝল না। কিন্তু যাবার সময় কেউ কেউ নিশ্চিত হয়েই গেল 'হালার কুনোদিকে কুনো তাল নাই। ঠ্যাং ফাটাইয়্যাও এমন ভাব য্যান লটারি পাইছে।'

ঘোড়াটা

পলান যখন পরিসংখ্যান শাস্ত্র নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, কিংবা ঘোড়া বিষয়ে রচনা লিখছে, তখন একগাছা নতুন ঝা চকচকে পাটের দড়ি দিয়ে ঘোড়াটা নতুন একটা খুঁটায় বাঁধা। সকাল বেলাতেই সে ওখানে বাঁধা পড়েছিল। পরিস্থিতি তখন বিশেষ অনুকূল ছিল না তার।

ঘোড়াটার সামনে পুরানো যোগাড়-করা একটা মাটির নাদায় কতগুলো ছোলা ভিজিয়ে দেয়া। ঘোড়াটা সেটা খানিক খানিক খাচ্ছে। আবার খানিক চোখ বুঁজে ঝিমানির তাল করছে। কিন্তু কোনোটাই বিশেষ সুবিধে তার হচ্ছে না। তার চারপাশে তখন এন্তার দর্শক। এই এতগুলো দর্শকের সামনে খাবার মতো একটা ব্যক্তিগত কাজ করতে খুব স্বস্তি তার লাগছে না। আরো কিছু ইহজাগতিক সঙ্কট নিয়ে সে তখন চিন্তিতও বটে। তার মধ্যে প্রথমটাই তাকে বিশেষ কাহিল করে রেখেছিল। আসবার কালে পথে তার নেহায়েৎ ভুলবশতঃ নাদি-ছাড়া হয়নি। এখন সেই অসমাপ্ত কর্তব্যটা পালন করতে তার মন ও শরীর দুই-ই চাইছে। পাশে এতগুলো দর্শক সমেত কাজটা করা তক্ষুনি ঠিক হবে কিনা সে ভেবে উঠতে পারছে না। অভ্যাগতদের নিরুৎসাহিত করতে সে চায়। বিশেষত এখানকার ঘরবাড়ির লাগোয়া চেহারা দেখে সে প্রথমেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল যে দর্শকের আনাগোনা এখানে একটা সাধারণ নৈমিত্তিক ব্যাপার হবে। তাই বলে প্রথম দিনেই আচ্ছামতো নেদে দিয়ে এদেরকে হতাশ করতে মন সায় দিচ্ছিল না। অধিকন্তু সে সাহেবালির আতিথেয়তার বহর দেখে বিশেষ নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। তাকে নিয়ে আসবার আগে কম করেও পাঁচবার মোলাকাত হয়েছিল তার নতুন মালিকের সঙ্গে। সাহেবালির এই পরিমাণ উৎসাহ দেখে ঘোড়াটা কেবল ভরসাই পেয়েছিল—বুঝি এক আরামখানায় যাচ্ছে। আসার পর ছোলার পরিমাণ দেখে তার আর বুঝতে বাকি নেই যে এটা নেহায়েৎ মেহমান হিসেবে পাওয়া। অচিরেই এটা শুকনো খড়ে গিয়ে ঠেকবে। এই এতরকম হৈ চৈ-এর মধ্যেও তার কয়েকবারই মনে হয়েছে যে সাহেবালির বড়জোর ছাগল কেনাই উচিৎ ছিল। আরো খান দুই বিষয় তখন ঘোড়াটার মাথায় ঘুরছে। একটা হলো, ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ওর চাকরি-বিত্তান্তটি কী হতে পারে। এসে কোনোরকম আন্দাজও করতে পারছে না। চারপাশে উৎসাহ হৈচৈ চেঁচামেচি তার ভালই লাগছে। কিন্তু সে নিশ্চিত কেবল এই আমোদের জন্য তাকে আনা হয়নি। দু'চারবার সে ভেবেছে আপাততঃ এই সব চিন্তা বাদ দিয়ে খানিক ঘুমাবে। কিন্তু যে বিষয়টা ভেবে সে ঘুমাতে পারছিল না তা হচ্ছে প্রথম দিনেই সে একটা গাধা-কিসিমের ঘোড়া হিসেবে পরিচিত হতে চায় না। এমনিতেও তাকে গাধা থেকে আলাদা করতে দর্শকের কসরৎ করা লাগে। কেবল ফোটো-দেখা জ্ঞানে সেটা সম্ভব নয়। সে নিশ্চিত অচিরেই পাছায় খোঁচা খেতে হবে। তখন সে একটা লাথি-গুঁতো জাতীয় কিছু না দিলে ওটা বাড়তেই থাকবে। ঝিমাতে থাকলে একটা ফ্যালফ্যালে ভাব তৈরি হতে পারে। ঘোড়াটা সেটা বরদাশ্‌ত করতে পারছে না।

ঘোড়াটা এত বিবেচনা করলে কী হবে ক্ষতি যা হবার তা ইতোমধ্যে হয়েই গেছে। পড়শিদের মধ্যে কেউ কেউ রায় দিয়ে দিয়েছে যে এটা আসলে একটা গাধা। সাহেবালিকে ঠকিয়ে এটা গছিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্য যারা গাধা-তত্ত্বে বিশেষ খুশি নয় তারাও এটাকে খচ্চর থেকে বেশি কিছু বলতে নারাজ। সাহেবালি ফুঁসছে। কিন্তু সেও ঠিক করে রেখেছে লোকজনের সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক সে করবে না। এটাকে কাজে লাগিয়েই সে দেখাবে। তবে লোকজনকে বিশেষ দোষ দেয়াও যায় না। ঘোড়া তারা দেখেছেই বা ক'টা! সিনেমায় যা দেখেছে সেগুলো ইয়া তাগড়া, নায়কের সাথে মানানসই মাপের। এর বাইরে মাঝে মধ্যে অনুষ্ঠান থাকলে পুলিশের একদল রাস্তায় ঘোড়া নিয়ে বের হয়। সেগুলো তো আরো বড়। আর তারা চুল কাটতে গেলে নাপিতের দোকানে মাঝে মধ্যেই বোরাকের ছবি দেখেছে। তো এরকম বাটু ছোটখাট ঘোড়া যে থাকতে পারে সেটা তাদের অনেক ধারণায় নেই। আর ধারণা থাকলেও পাড়ার একমাত্র ঘোড়াটাকে কেই বা এরকম দেখতে চায়! তাদের মনের বাসনাটা হলো সাহেবালি একটা উঁচা-লম্বা ঘোড়া নিয়ে আসবে। একজন বলেই বসল, 'ঘোড়া হবে উঁচা-লম্বা-তাগড়া'। সাহেবালির উত্তর রেডি: 'তুমি উট দেখিছ।' এটাকে যদি গাধা বলতে পারে তাহলে তাদের দেখা ঘোড়াগুলোকেও সে উট বলতে পারে! সাহেবালির প্রত্যুৎপন্নমতিতায় ঘোড়াটা খুশি হয়। আরেকজন সাহেবালিকে বলে, 'তুমি একটা ছাগল কিনলেই পারতা।' সাহেবালি এইদিন খুবই প্রসন্ন। 'ছাগলে আমার গাড়ি টানবে? আর ছাগল দেখতেই ছাগল, খায় তো একটা হাতির নাহান।' নিজের কাজ সম্পর্কে ঘোড়াটার একটা ধারণা হলো বটে। কিন্তু ঘোড়াজাতির কৃচ্ছতাসাধন সম্পর্কে সাহেবালির জ্ঞানের বহর দেখে ঘোড়াটা প্রমাদ গুণল।

বেলা বাড়তে থাকলে পড়শিদের অনেকেরই হুঁশ হয়। যে দু'চারজন স্কুল পালিয়ে এসে ঘোড়া দেখছিল তাদেরকেও তখন আবিষ্কার করা হচ্ছিল। যে যার মতো রওনা করার একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে। কলমিই উদ্যোগ নিল: 'নতুন জিনিস। মাথা খারাপ কইরে দিও না।'

কলমি

সাহেবালির সঙ্গে কলমির বিয়ে হয় ঘোড়াটা আসার দশ বছর আগে। বিয়ের ঠিক কিছুদিন আগে কলমির মা-বাবা ময়মনসিংহের এক গ্রাম থেকে ঢাকায় আসে। সাহেবালিরা আগে থেকেই ছিল। কমলাপুর বস্তিতে। সেখানেই ওদের বিয়ে হয়। কলমিরা ঢাকায় আসে ময়মনসিংহের সেই গ্রামে আর কোনোভাবেই বেঁচে-থাকার-উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে। কলমি বড় ছিল বলে পরিস্থিতিটা বেশ বুঝত। এবং বেঁচে থাকার উপায়সমূহ খুঁজতে কলমির বিয়েও যে একটা প্রসঙ্গ সে বিষয়ে তার বিশেষ সন্দেহও ছিল না। ফলে সাহেবালিকে একই বস্তির মধ্যে যখন আবিষ্কার করা হলো, কলমি পূর্ব-সিদ্ধান্ত মোতাবেক এসব নিয়ে কথা না-বাড়িয়ে কবুল করেছে। লোকটাকে সে দু'চারবার দেখেছিলও বটে। এবং কলমির তাকে ভালই লাগত।

তবে কলমির আসল দেখাদেখির সূচনা হয় বিয়ের পর। যখন প্রতিটা ঘণ্টা আঠার মতো লেগে থাকত বাসায় তখনই কলমি সাহেবালির গুণের বাহার টের পেতে শুরু করে। বিশেষতঃ সাহেবালির লাগাতার উদ্ভাবনী ক্ষমতা নিয়ে কলমি অচিরেই সন্ত্রস্ত, এবং পরিশেষে অবসন্ন, হয়ে পড়ে। কলমির জন্য পরিস্থিতিটা আরো দুরূহ হয়ে পড়ে যেহেতু সাহেবালি তার উদ্ভাবনী ক্ষমতার সবচেয়ে বড় গুণগ্রাহী হিসেবে কলমিকে সবসময়েই চাইত, এবং আন্তরিকভাবেই। কলমি বরাবর সাহসী ধরনের মেয়ে। কিন্তু তাই বলে সাহেবালির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাহবা দেয়া বেশ কঠিন ছিল ওর জন্য। নিজের মা-বাবা ভাইবোনদের পরিস্থিতি থেকেই কলমি জানত বেঁচে থাকা সমূহ কঠিন এবং বিস্ময়কর একটা ঘটনা। এবং বেঁচে থাকার উপায় খুঁজে বের করা সহজ কাজ বিশেষ না। সেই উপায়গুলোই যখন পরম আয়েশে সাহেবালি সকালে একটা আর বিকালে একটা খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা করেছিল তখন কলমির আতঙ্কিত না হয়ে উপায় ছিল না। বিয়ের এক বছরের মাথাতে পলান চলে এসে কলমির আতঙ্কটাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল কেবল। সাহেবালিও তখন নানারকম স্বঘোষিত ছুটি নিয়ে বাসায় বসে সময় কাটানো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

একেক সময় কলমির মনে হয়েছে বেঁচে থাকার দুঃসহ যন্ত্রণাটা সাহেবালি গভীরভাবে বোঝে বলেই এরকম খ্যাপা। আবার অন্য সময়ে তার একদম অন্য কথা মনে হয়। তখন মনে হয় বেঁচে থাকাটাকে কিছুতেই যন্ত্রণার হতে দিতে চায় না সাহেবালি, তাই সে অমন আউলা। আবার আরেক সময়ে কলমির মনে হয় সাহেবালি বেঁচে-থাকা নিয়ে এক পরম পরিহাস রচনা করতে চায়। এই সংকল্পে অবিচল বলেই ওর অফুরান প্রাণশক্তি। সাহেবালির সঙ্গে সংসারে কলমি যত দিন-গুজরান করেছে, ততই নিস্পৃহ হতে শিখেছে। একরকম প্রসন্নতাই সেটা। দিনকে দিন সে সাহেবালির এই খ্যাপামির একজন অন্তরঙ্গ গ্রাহক হয়ে পড়েছে, আর গভীর মমত্ব তৈরি হয়েছে তার লোকটাকে নিয়ে। একটা কারণ হলো সে নিজেও সেখানে বাৎসল্যেই থাকে। আর পলির জন্মের পর সাহেবালি যে তাকে খাবার-বড়ি নিয়ে এসে দিয়েছে সেটা নিয়ে সে পরম কৃতজ্ঞও বটে।

সাহেবালির প্রাণশক্তি নিয়েই এখন সে বেশি মনোযোগী। নাহলে যে-মাত্র একটা কোনো রুজির ব্যবস্থায় সাহেবালি দু'চার কদম আগায় সেখান থেকেই পরিত্রাণের জন্য তার নিঃসীম ব্যাকুলতা দেখে কলমির ঝগড়া বাধানোর কথা। কলমি ঝগড়া বাধায় না। সাহেবালিকে তার বিশেষ ঝগড়ার উপযোগীও মনে হয় না। চরম অপছন্দের মুহূর্তে ঘাড়-গোঁজ করে বসে থাকা ছাড়া উচ্চকিত কোনো ঝগড়া করতে সাহেবালিকে বিশেষ পারঙ্গম তখন একদমই মনে হয় না। অবশ্য কলমি জানে এটা একটা অস্ত্র ওর। না হলে হাত-পা নাচিয়ে ঝগড়া করতে সাহেবালির জুড়ি নেই। কোনো একটা কাজ থেকে যখন সে অবসর নিয়ে আসে, প্রায়শঃই সেটা একটা ঝগড়া দিয়ে শেষ করে। কলমি বহুবার বলেছে 'কাম করবা না ভাল কথা। তুমি তো মন ঠিক কইরেই গ্যাছো। গ্যাছো না? তো ঝগড়া বাধানোর কাম কী?' সাহেবালি সেসবে দমে না: 'এ্যাগোরে চিনস তুই? ঝগড়া কী? আমার তো পোরতি দিন মাইরে ফ্যালাইতে মন লয়।' কলমি আর কথা আগায় না। কলমির এরকমও মনে হয় যে কাজ ছাড়াটা আসলে বাহানা। ওই ঝগড়াটা করতে চায় বলেই ও কাজ ছাড়ে। কিন্তু কলমির ভয় ধরে। চড় থাপ্পড় তো নিত্য নৈমিত্তিক! কিন্তু কোনোদিন যদি ওরা সাহেবালিকে আচ্ছামতো পেটায়! সে কথাও বলেছে। কিন্তু সাহেবালির সোজা উত্তর—'ও এমনিতেই মাইরতিছে। তুই বুধয় ট্যার পাস না।'

এতকিছুর পরও আধপেটা খেয়ে আর এখানে সেখানে খুচরা কাজ করে কলমির জমানো দু' হাজার টাকায় সাহেবালি যখন ঘোড়াটা কিনতে মনস্থির করে, কলমি মানা না করে পারেনি। সাহেবালি বরাবরের মতো উৎসাহী হয়ে কলমিকে বুঝিয়েছে কীভাবে এই ঘোড়ার সঙ্গে একটা গাড়ি লাগিয়ে সাবলম্বী হয়ে যাবে সে। শহরের প্রান্তে সেই ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে সে সংসার চালাবে। এবং, ফলতঃ, তাদের জীবনে নিশ্চিন্ত একটা বেঁচে-থাকার-উপায় হয়ে যাবে এটা। এরপর সাহেবালি আর নতুন কোনো কিছু নিয়ে মাথা ঘামাবে না। কলমি সেটা বিশ্বাস করেছে সে ভরসা তার চোখের দিকে তাকিয়ে সাহেবালির একটুও হয়নি। তখন সে আবার গোড়া থেকে ঘোড়ার-গাড়ির উপকারিতা বিষয়ে একটা আলোচনা শুরু করল। তবে এবারে অনেক অনুচ্চ গলায় এবং খুবই নড়বড়ে ভাবে। কলমি সেটাও পুরোটা বসে থেকে শুনল। তারপর যে দু'চার গ্রাশ ভাত তখনো ছিল তা সাহেবালিকে খাবার জন্য বেড়ে দিল। সাহেবালি সেখান থেকে আবার অর্ধেকটা প্রায় জোর করেই কলমিকে খাইয়ে দিল। আধপেটা খাওয়া বা না-খাওয়া কলমির নৈমিত্তিক অভ্যাস। আসলে সাহেবালিরও তাই। কেবল দু' হাজার টাকাটাই কলমির খচখচ করছিল। পেটের ব্যথা যখন ওর খুব বাড়ে তখনো এই টাকা দিয়ে ডাক্তার দেখানোর কথা মাথায় আসে না কলমির।

ঘোড়ার গাড়ি

যাকে এইরকম গুরুতর একটা দায়িত্বে মুখ্য অনু-ঘোটক বানিয়ে আনা হয়েছে, সেই ঘোড়া কিন্তু গাড়ি সম্পর্কে কিছুই জানে না। অন্ততঃ সাহেবালি পড়শিদের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলবার আগ পর্যন্ত। সাহেবালিও নাচার। তার পক্ষেও সম্ভব ছিল না গাড়িটাকে নিয়ে এসে ঘোড়াটার সামনে রাখা যাতে ঘোড়াটা তার গাড়ি জানতে পারে।

গাড়িটা যে ঘোড়ার তাতে সাহেবালির সন্দেহ ছিল না, কিন্তু সম্প্রদান করবার জন্য গাড়িটা তখনো সাহেবালির ছিল না। কোথাও নেই সেটা। ঘোড়ার আগে সে গাড়ি আনেনি।

শলা-পরামর্শ বিশেষ করবার লোক সাহেবালি নয়। কলমি বাদে যে ক'জন ইয়ার-পড়শিকে সে ঘোড়ার গাড়ি বিষয়ে আগাম জানিয়েছিল তাদের কেউই সাহেবালিকে উৎসাহ দেয়নি। 'এ্যাদ্দিন কিছু হয় নাই, এহন ঘোড়ার গাড়ির পেছনে পড়ছ?' এই সব নৈরাশ্যব্যঞ্জক কথাবার্তা শুনলে সাহেবালির গা জ্বলে যায়। অন্য দু'চার জন অবশ্য সংকটটার গভীরে যাবার চেষ্টা করেছে। 'এতগুলান টাকা আবার খরচ করবা?' এই ভাবনাটা যেহেতু সাহেবালি নিজেও ভেবেছে, পরন্তু টাকাটা আবার কলমির, ফলে সে মাথা নিচু করে এই বক্তব্য শুনেছে। অন্য দু' একজন একদম বাস্তব সমস্যা সামনে নিয়ে এসেছে। 'ঢাকার শহরে তোমারে ঘোড়ার গাড়ি চালাইতে দেবে?' সাহেবালির সাফ জবাব। 'দুর মিয়া! এইড্যা এড্ডা ব্যাপার অইল? ঘোড়া কি মাইনষের থিকাও খারাপ? মাইনষের ঠেলাগাড়ি যদি ঢাকার শহরে চালাইতে দ্যায়, আমার ঘোড়ার কিয়ের দোষ?' সাহেবালির ইয়ার-পড়শিরা তার বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়ে কখনোই তারিফ করে না। কিন্তু এ দফা সাহেবালির এই প্রশ্নটা যে শক্ত তা তারা স্বীকার করে নিয়েছে সবাই। ঠিকই তো! মানুষে টানা ঠেলাগাড়ি তো ঢাকাতে আছেই। ঘোড়ার গাড়ি চলবে না কেন? সাহেবালি অবশ্য সবাইকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছে যে শহরের মধ্যখানে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে যাবে না। গাবতলীর বাজারে কাঁচামাল নেয়া আনা করবে। অল্প স্বল্প ইট বালি যাদের লাগে, সেইসব সে টানবে। আর যদি কেউ শখ করে ঘোড়ার গাড়িতে করে চিড়িয়াখানা বা বোটানিক্যাল গার্ডেন যেতে চায় তো নিয়ে যাবে। পাড়ার লোক বলে সে বেশি ভাড়াও নেবে না। মোটামুটি পরিকল্পনা তার পাকাই দেখতে পেল সবাই।

ঘোড়াটা সাহেবালিদের বাসায় আসার তিন-চার দিনের মাথাতেই একটা গাড়ি ঘোড়ার পাছায়, আসলে কাঁধে, বেঁধে দেয়া হলো। বাঁশ দিয়ে বানানো জোড়াতালির একটা গাড়ি। নতুন প্রাপ্ত এই নিরঙ্কুশ মালিকানার অবশিষ্টটি তার পাছায় লাগানো হয়েছে দেখে ঘোড়াটা যে বিশেষ খুশি হলো তা কিন্তু মনে হয় নি। বরং এই প্রাপ্তিতে এক ধরনের ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েই সে থাকল। খুব একটা পিছন ফিরে দেখারও চেষ্টা করল না কীসের সে মালিক হয়েছে। ঘোড়ার এই ভ্যাবদা-মারা অবস্থা দিনকে দিন বাড়তেই থাকল যখন তারই সেই মালিকানাধীন গাড়িতে সাহেবালি চড়ে বসে এখানে সেখানে নিয়ে যেতে শুরু করল। এটা তখন নিত্য-নৈমিত্তিক দৃশ্য ছিল যে শহর-প্রান্তের কোনো রাস্তার মাঝখানে ঘোড়াটা গাড়িভর্তি বালি নিয়ে, কিংবা পুঁইশাক আর কুমড়া নিয়ে, ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস টানছে। আর সাহেবালি ঘোড়ার ঘাড়ে, ল্যাজে, কানে টানাটানি বা গুঁতোগুঁতি করে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে দাঁড়িয়ে থাকা তার কাজ নয়।

পলানের পালানো

পালানো বলা হলো বটে, কিন্তু পলানের পালানো নিয়ে পড়শিদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে। একদলের মতে, পলান ওর খ্যাপাটে বাবার অনাচারে অতিষ্ট হয়ে নিজের জীবন নিজে গড়ে নিতে পালিয়েছে। শহরের কোথাও সে আপাততঃ গা-ঢাকা দিয়েছে। সাহেবালি যদি কিছুমাত্র দায়িত্ববান এই এতদিনেও হয়ে থাকে তাহলে তার উচিত হবে এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করে তাকে খুঁজে বের করা। অন্যদল এই প্রস্তাবে একেবারেই গা করেনি। তাদের বক্তব্য হলো, সাহেবালি আসলে পলানকে খুবই ভালবাসে। আর পলানের মতো বিচক্ষণ ছেলে এই অবস্থায় বাবাকে একা ফেলে পালানোর মতো নয়। ওকে আসলে ছেলেধরারা নিয়ে গেছে। ইন্ডিয়া, পাকিস্তান কোনো জায়গায় পাচার করা হয়েছে পলানকে। তাদের কিছুই করার নেই। সকলের দোয়া করা উচিত যাতে পলান সহি-সালামতে হাত-পা সহ বেঁচে থাকে। তিন নম্বর থিসিসটা আরো মর্মন্তুদ। সেই অনুসারীদের মতে, পলান ওর মা আর বোনের মরে যাওয়ার কষ্টে পাগল হয়ে গেছিল। কোথাও হারিয়ে গেছে। এখন ও আর চিনে বাবার কাছে আসতে পারছে না। পাড়ার দোকানের সামনে বসে এই ধরনের নানামুখী আলাপ-আলোচনায় পড়শিরা সবাই ন্যস্ত থাকে।

কেবল যে লোকটা এসব বিষয়ে কিছুই বলে না, আসলে কোনোকিছু নিয়েই আর কিছু বলে না, সে হচ্ছে সাহেবালি। ঘোড়াটা আসবার বছর তিনেক পরের ঘটনা এগুলো।

পলি মারা গেছিল তিন দিনের জ্বরে। সেই জ্বরে পড়ার দিন থেকেই সাহেবালি দৌড়াদৌড়ি করেছে। ওষুধপত্তর এনেছে। কিন্তু জ্বরে যে একটা মানুষ মরে যেতে পারে সেটা খুব মাথায় তার ছিল না। তবে মাথায় থাকলেও দৌড়াদৌড়ি করা আর কিছু ওষুধপত্তর আনা ছাড়া ভিন্ন কিছু সাহেবালি করত কিনা বলা মুস্কিল। পলি মরে গেলে পলান এক সপ্তাহ স্কুলে যায়নি। তবে কলমি মারা যাবার সময় সাহেবালি এবং পলান তাকে হাসপাতাল পর্যন্ত আনতে পেরেছিল। 'পেটে ব্যথা' 'পেটে ব্যথা' বলতে বলতে কলমি যেদিন থেকে চেঁচামেচি করতে শুরু করেছিল সেদিনই সাহেবালি আর পলান তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। সাহেবালি খুব ভালই জানত কলমি ঠিক চেঁচিয়ে পাড়া-মাথায় করবার মেয়ে না। পড়শিরা অনেকেই যদিও ঘোড়ার গাড়িতে নিয়ে যেতেই বলছিল, কিন্তু সাহেবালি একটা রিকশাই ডাকে। হাসপাতালে কলমি ছিল পাঁচ দিন। পুরাটা সময় সাহেবালি তো ছিলই, কলমি পলানকে কাছ-ছাড়া করত না। কেবল পলানের হাত ধরে রেখে শুয়ে থাকত। ওর দু' চোখের কোণা দিয়ে এক ফোঁটা দু' ফোঁটা পানি গড়াত। কাঁদত পলানও।

ফলে পলানের পালানো বিষয়ে শেষের থিসিসটার বিশেষ শক্তিমত্তা লক্ষ্য করা যায়। যদিও, ক'দিন পরপরই কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও, পলানকে দেখেছে বলে দাবি করত। কিন্তু সাহেবালিকে আরেকটু গুছিয়ে কেউই কোনো তথ্য কখনো দিতে পারেনি। যাবার আগে, অথবা ছেলেধরারা নিয়ে যাবার আগে, পলান তার ঘোড়া-বিষয়ক রচনাটার একটা পরিমার্জিত সংস্করণ করেছিল। সেটা জানা যায় কারণ পলানের অন্তর্ধানের পর সাহেবালি পলানের যাবতীয় জিনিস-পত্র টেনে-হেঁচড়ে বের করেছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। পলানের নানারকম রচনা নিয়ে সে পাড়ার দোকানে এসেছিল। পলানের বিচক্ষণতায় যে ক'জন পড়শি মোহিত ছিল তারা সেগুলো নাড়াচাড়া করেছে। যারা পড়তে জানে তারা পড়েও শুনিয়েছে। এর মধ্যে ঘোড়া বিষয়ক রচনাটাই সাহেবালির বেশি মনে ধরেছে। ইদানীং সাহেবালি সেটা সঙ্গে করেই রাখে। রচনাটা পলান শেষ করেছে এভাবে—

> "... আর ঘোড়াদের জীবনে ভারি দুঃখ। তাদের মা থাকে না। থাকলেও কাছে থাকে না। তাছাড়া এখন মানুষেরা খুব বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় ঘোড়া খুবই কম। ফলে ঘোড়াদের অনেক বোঝা টানতে হয়। ঘোড়া আর মানুষ সমান হলে ভাল হয়।"

ঘোড়ারোগ

সাহেবালি আর ঘোড়াটার মধ্যে আগে কার রোগ হয়েছে বা ধরা পড়েছে সেটা বলা খুব মুস্কিল। বয়সের হিসাবে সাহেবালিরই হবার কথা। সাহেবালির বয়স তখন প্রায় ৪০ হয়েছে। ঘোড়াটার বয়স কিছুতেই চল্লিশ হবে না। তাছাড়া সব সময়ে বয়সের হিসাব খাটেও না। যেমন কলমি ৩৩ হতে না হতেই মরে গেল। পলি মরল ৮ ডিঙিয়েই। তারপরও যেহেতু ঘোড়াটা আর সাহেবালি প্রায় একধরনেরই কাজ করত, আর দুজনেই পুরুষ—একটা তুলনামূলক খতিয়ান হতেই পারে। শেষের একটা বছরে আসলে সাহেবালিকেই বেশি রুগ্ন মনে হতো। কিন্তু সেটার একটা কারণ হতে পারে সাহেবালিকেই লক্ষ্য করা হতো বেশি। নাহলে ঘোড়াটা যে সারাটা সময় মাথা নামিয়ে রাখছে, ফোঁস ফোঁস করে ঘন ঘন শ্বাস ছাড়ছে, আর এমনকি চোখ দিয়ে কিছু পানিও গড়ায় সেগুলো খেয়াল করবার মতোই ছিল। অন্ততঃ সাহেবালি সেটা নিরন্তর খেয়াল করেছে। আর ওর আপাতঃ খালি বুকটা ভ'রে ঘোড়াটার জন্য বাৎসল্য জেগে উঠত। ঘোড়াটার গলায় তখন হাত বুলিয়ে আদর করে দিত সাহেবালি। পাশে যে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকত তখন তাকে সেই কথা বলতেও সে ভুলত না। 'ঘোড়াডার শরীল এক্কেরে গ্যাছে।' মানুষে তথাপি ঘোড়ার শরীর নিয়ে বিশেষ চিন্তিত হয় না। বলে—'নিজের শরীল দ্যাখছ?' পরের দিকে সাহেবালি একা একাই ঘোড়ার স্বাস্থ্য নিয়ে বিলাপ করেছে। বা ঠিক একা নয়, করেছে আসলে ঘোড়াটারই সাথে।

যে রাত্রে পলিথিনের ছাবড়ার নিচে ঘোড়াটা কেবল ডাকতে থাকল, সাহেবালির তখন বেজায় জ্বর আর দাস্ত। তারই মধ্যে সে লাগোয়া বাসার সবগুলোতে গিয়ে গিয়ে খবর দিয়েছে 'ঘোড়াডার অবস্থা কইলাম ভাল না। তোমরা একটু দেইখো। আমার শরীলডা সুবিদা যাইতাছে না।' বংশীর বউ সাহেবালিকে বসিয়ে ভাতের মাড়ে ভাত মেখে, লেবু দিয়ে খাওয়াল।

সকালে সাহেবালি ঘোড়ার ডাক আর শোনে না। কুঁজো হয়ে সে বাইরে আসে। পড়শিদের দু'চার জন দেখেছে। তারা সাহেবালির জন্যই অপেক্ষা করছিল। বাঁশে ঘোড়াটাকে বেঁধে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হবে। সকলেই সাহেবালিকে মানা করছে। 'তোমার শরীলে তো খাড়াইতেই পার না। ক্যান তুমার ঘোড়া আমরা ঠিকমতো মাটি দিমু না?' সাহেবালিও বলে 'দুর মিয়া! তোমরা আছ বইলাই তো ভরসা। শরীল এড্ডা ব্যাপার অইল? আমার ঘোড়া আমার কান্ধে না উঠলে জবাব দিব কী?'

এর নয়দিন বাদে পড়শিরা যখন জানাজা শেষ করে দোকানের সামনে আসল তখনই কেবল তাদের সাহেবালির স্মৃতিচারণ করার সুযোগ হলো। জানাজাটা কর্তব্য, কিন্তু লোকটাকে নিয়ে জানাজায় তো আর মন খুলে আলাপ করা যায় না। এই বস্তির মোড় বা দোকানই তাদের ভাল। সাহেবালিকে নিয়ে কথা বলতে বসে, এই প্রথম বরং, তারা ঘোড়াটা নিয়েই আলাপ করে। যে সাহেবালি ঘোড়াটার স্বাস্থ্য নিয়ে কাউকেই তেমন চিন্তিত করাতে পারেনি, উল্টো লোকজন তার দিকেই দেখাত, সেই সাহেবালি মরার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পড়শিরা সবাই একমত—'ঘোড়াডার কপাল রে ভাই! এই মরাডা যদি হ্যায় আগে মরত...।'

দোকানদার চার টাকার সুজি মাপছিল পাল্লায়। সে সবাইকে পলানের রচনাটার কথা মনে করিয়ে দেয়।

বিরুদ্ধাচরণ

বাতাসটাকে প্রথমে মনে মনে মাপবার চেষ্টা করে রহমত। বাতাসের গতিকে তার দিকভ্রান্ত মনে হয়। একেকবার সে ঠাহর করে শহরের পাদদেশ থেকে দক্ষিণা বাতাস তাকে সাহস দেয় 'জোরসে চলো'। পরমুহূর্তেই মনে হয় পুবদিকের বাধানো উঁচু মহাসড়ক থেকে বাতাসটা ঘুরে ঘুরে আসছে, আর তাকে সরিয়ে দিতে চাইছে পশ্চিমের রহস্যময় খোলা প্রান্তের দিকে। আবার সে একেকবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে টের পায় বাতাসটা খাড়া উত্তর দিক থেকে এসে তার গলুয়ে দুইভাগ হয়ে যাচ্ছে। তার গা শিরশির করতে থাকে। দিকভ্রান্ত বাতাসের কোন কারণ সে খুঁজে বের করতে পারে না। রহমত তবু একটুও বিচলিত হয় না। খোলা আকাশের নিচে, অমাবস্যাস্নাত একঝাঁক নক্ষত্রকে সাক্ষী মেনে বাতাসকে সে শাপশাপান্ত করে। এইরূপ উদাত্ত গালাগালে সে আরো দৃঢ় হয়। বাতাসের পাগলামি ছুটিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করে। শক্ত হাতে সে বাঁশের লগিটা আঁকড়ে ধরে। সম্মুখে তার যেতেই হবে। কিন্তু উত্তরের বাতাসটা তার গায়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

সন্ধ্যাবেলায় জয়মন তাকে নিয়ে বসেছিল। তেল গরম করে পিঠ হাত সব মালিশ করে দিচ্ছিল। আর ঘরসংসারের এটা সেটা কথা। জয়মন রহমতের পিঠে তেল মাখাচ্ছে আর রহমত মাটিতে বসে দুইহাঁটুতে দুইহাতের কনুই রেখে মাথাটা ঝুলিয়ে। ও চোখ তুলে দূরে সামনের পানির বহরকে দেখবার চেষ্টা করছে। রহমতকে তখন রাগী ষাঁড়ের মত দেখায়। কিন্তু জয়মন তা দেখতে পায় না। জয়মন বলে চলেছে অন্য কথা—

'এতকিছু তো তোমারে ভাবতে কই না।...তুমি খালি মাথাডা ঠাÊা রাইখা চইলো।'

জয়মন একটু বিরতি দিয়েছিল। ও ভেবেছে রহমত নিশ্চয় এই কথার প্রতিবাদ করবে। রহমত তা করেনি। তার চোখ যদি জয়মন দেখতে

পেত তাহলে সেও বুঝত রহমত এসব কথার প্রতিবাদ না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। জয়নব তা জানে না। ও বলেই যায়—

'রোজ রাইতে জ্বর, এডা তো ভাল মনে হয় না। পোলাপান সব দুধের এগুন। তোমার শরীল খারাপ হইলে আমরা কই যামু।...তুমি মাঝরাইতে ঘুরতি বাইর হও। এডা কুন ধরনের পাগলের বাতিক!'

জয়মন আবার থামে। এবারে আর ও রহমতের প্রতিক্রিয়ার জন্য থামে না। জয়মনের গলা ধরে আসে। রহমতের তল পায় না জয়মন। গত একটা বছর ধরে রহমত গুম মেরে গেছে।

সকাল বেলায় উঠে নদী আর হাওড় যে সীমানায় একাকার হয়ে আছে সেখানে একটা গামছা গলায় গোসল করতে যায় রহমত। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গোসল করে ঘরের দাওয়াইয়ে বসে। আগের দিনগুলোতে এ সময়টাতেই রহমত নানান রকম খুনসুটি করত জয়মনের সঙ্গে। খাবার আধপেটা থাক আর না থাক রহমতের মেজাজ সকল সময়েই এক। জয়মনকে খেপানো ছাড়া ওর শান্তি নেই।

'চুল বানলি। কই যাবি?'

'কই যামু?'

'আমি কেমনে কমু। আমারে কি আর কসনি?'

আর হাসি। রহমতের এই খুনসুটি জয়মনের মনে হয় যেন কোন জনমের স্মৃতি। রহমতের রূপান্তর জয়মন দেখতে পাচ্ছিল। তখনই এক ঠাÊা ভীতি তাকে কাঁথার মধ্যেও আঁকড়ে ধরত। অথচ শুকনো রহমতের শরীরেও খড়ের গাদার মতো ওম পেত জয়মন, সব সময়ে। রাতের বেলায় জয়মনকে শক্ত করে ধরে আজব আজব সব গল্প করত রহমত। আর দুজনে মিলে হাসতে থাকত। অথচ সেই লোকটাই হাসি নাই, শুয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে, সেই একই প্রসঙ্গ।

'চায় কী এ্যারা ক' তো!'

'এ্যাতো চিন্তা কর ক্যান। সবাইর যা হবে আমাগেরো হবে।'

'কী হবে সবাইর? পানির লগে এ্যাতো কোস্তাকুস্তি কিয়ের? দুনিয়ার জাগাতেও এদের হয় না?'

'তুমি এ্যাগোরে থামাইতে পারবা?'

জয়মন রহমতের বদলে-যাওয়া দেখছিল। সেই যখন থেকে মাটি-ফেলা শুরু হলো হাওড়ের পেটের মধ্যে তখন থেকেই রহমত উন্মনা, উচাটন, এবং ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ। পয়লায় সেই ক্ষুব্ধতা সে প্রকাশ করেছে। একমাত্র সঙ্গী সেসবের জয়মন। জয়মন সেসব কথা শুনে সন্ত্রস্ত বোধ করত, এমনকি অসহায়ও। শেষের দিকে পরিশ্রান্তও সে বোধ করেছে। সেই পরিশ্রান্তি থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষাতেই হোক, আর সন্ত্রস্ত হতে চায় না বলেই হোক জয়মন নিরন্তর নিরুৎসাহিত করে গেছে রহমতের ভাবনা-প্রবাহ। আর রহমত এভাবে বলতে বলতে হঠাৎ করেই একদিন থেমে গেছে। যেন ওর সকল বলাবলি শেষ। নিস্তব্ধ রহমতকে দেখে জয়মনের একেক সময় মনে হয়, যখন সন্ধ্যাতেই আজ পিঠে তেল মালিশ করে দিচ্ছিল তখনও তাই-ই মনে হয়েছে—বোধহয় জয়মনের নিরুৎসাহিত করায়, বোধহয় জয়মনের পরিশ্রান্তিতে রহমত চুপ মেরে গেছে। হয়তো ওর জবানের আর কোনো সাথি সে খুঁজে পায় না। গাঢ় অন্তর্গত একটা ব্যথা আচ্ছন্ন করে রাখে জয়মনকে। জয়মনের ভীষণ কান্না পায়। কিন্তু রহমত অবিচল, আর রাগী একটা ষাঁড় যেন।

পদ্মার কিনার থেকে যে সড়কটা সাপের মতো এঁকে বেঁকে একটানা ফুঁসতে ফুঁসতে ঢাকা শহরে এসে বিশ্রাম নিয়েছে সেটাকে সবাই বলে আরিচা মহাসড়ক। আর শহরে ঢুকবার কয়েক কিলোমিটার আগে, শ্রাবণ কিংবা ভাদ্রের বর্ষায় দুই ধারে টৈটম্বুর পানির মেলা। বাতাসে বিস্তীর্ণ সেই জলরাশির মাতম দেখলে ভ্রম হয় বুঝি ঢাকা শহর একটি দ্বীপ। সেই জলরাশির ওধারে সেই দ্বীপের অর্ধদৃষ্ট আকাশছোঁয়া দালানেরা ভিড় করে থাকে। শহরের সমীপে যেতে যেতে, যাবার ইচ্ছায় বুঁদ থেকে থেকে, ঢাকা নগরীকে তখন মায়াবী এক রাজ্য বলে মনে হয়। মনে হয় সেখানে বুঝি কোন জাদুকর আছে, বুঝি সে ইচ্ছে হলেই একটা খেলা বাধিয়ে দিতে পারে। নাহলে এই আকাশ মাখামাখি করে রাখা জলের মধ্যে কোত্থেকে এক নগরী জাগরূক থাকে, পুষ্ট হয়, আর বৃদ্ধিশীল হয়!

সবাই জানে ঢাকা নগরী বুড়িগঙ্গার তীরে। সেই শৈশব থেকে, এমনকি যারা কস্মিনকালেও ঢাকাতে আসেনি তারাও, সকলেই জানে। অথচ এই বিস্তীর্ণ জলরাশির সঙ্গে একাকার হয়ে যে নদীটা ঢাকাকে এ কিনারে আদর করে ছুঁয়ে গেছে তার নাম তুরাগ। আষাঢ়ে, শ্রাবণে কিংবা ভাদ্রে সেই তুরাগের পানি আর সড়কের দুই ধারে বিশাল জলাধার মাখামাখি হয়ে থাকে। তুরাগ নিজেও তখন জানে না তার সীমানা কোথায়। কিংবা আশ্বিনে পরিষ্কার আকাশে যখন পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে তখন শরিকি উৎসবে তুরাগ যেমন বুকে করে রাখে তাকে, এই সুবিশাল হাওড়খানিও। হাওড়ের বুকে দুরে হঠাৎ যেখানে চোখ থমকে যায় সেটা আবার অন্যরকম মায়া। যেন সবুজ দ্বীপ একটা। হাওড়ের পানির মধ্যে এরকম থাকে। আর শীতে তো হাওড়ই থাকে না। যখন ঢাকার আবছায়া কোঠাবাড়িগুলো, আর এই জলরাশির মায়া দুরপাল্লার বাসযাত্রীকে আধঘুমে নিয়ে যায় তখনই চোখে পড়ে শ্যামনগর। ঘন সবুজ গাছেদের ফাঁকে কয়েকখানা ঘর। যেখানে রহমত আর জয়মন থাকে, অন্যরাও থাকে।

চারপাশে হাওড়ের পানি-ঘেরা এই ছোট্ট একখÈ চাঁতাল কীভাবে শ্যামনগর হলো সে এক অজানা রহস্য। কখনো কোনো পাঠ্যকিতাবেই এসব বিবরণী লেখা থাকে না। শ্যামনগরের পাশ দিয়ে টলায়মান কিন্তু দৃঢ় কোশায় চড়ে অনতি দুরে যে আরেকখানি দ্বীপে গিয়ে ওঠা যায় সেটা অবশ্য রাধানগর নয়। এগুলো হচ্ছে মহাসড়কের পশ্চিমে। পুবদিকে তুরাগ এক মোচড়ে যে মোহনা বানিয়েছে সেখানে ত্রিবেণীতে এক জনপদ, ত্রিভূজাকৃতির এক ছোট্ট দ্বীপ। আর তারও আগে উত্তরে দ্বীপ নয়, হাওড়ের বুক চিরে আরেক জনপদ দাঁড়িয়ে গিয়েছে—বলিয়ারপুর। ভরা বর্ষায় এর সবকিছু থৈ থৈ পানির বরাবর। কেবল এই মহাসড়কটাই হাওড়ের বুক চিরে গেছে। অনাকাঙ্ক্ষিত এক বিযোজ্যতার নিমিত্ত বলেই বোধহয় সড়কটাকে ভারি দাম্ভিক আর সুদুর মনে হয়, এমনকি সেটার উপর দাঁড়িয়ে কিংবা কোনো যানের সওয়ার হয়ে। আর শ্রাবণের পানির স্রোত সড়কটার বাঁধানো কিনারে আছড়ে আছড়ে পড়ে সেই বিক্ষোভই জানায়। সড়কটাকে চূর্ণ করতেই চায় তারা। তাই ফি বছর সড়ক বাঁধানোর জন্য আরো আরো নতুন প্রকৌশলী জড়ো হন সেখানে।

এর সবই রহমতদের জীবনে অমোঘ এক ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বাস্তবতা হিসেবে চলমান। বর্ষায় কিংবা শীতে, শরতে কিংবা গ্রীষ্মে। কিন্তু শীতের শুরুতে এইসব জলরাশি কোথায় গিয়ে লুকায় তার হিসাব পাওয়া যায় না। হাওড়ের বুক থেকে থেকে তখন ধুসর রঙের মাটিরা প্রথমে, পরে সবুজ ঘাসেরা অগ্রবর্তী হয়। যেসব মাছেরা বর্ষায় এই হাওড়ের বাসিন্দা থাকে আর এজমালি উৎসবের নিমিত্ত হয় তাদেরও কোনো দিশা তখন থাকে না। পশ্চিম পাশে যখন ধুসর মাটি সবুজ ঘাসেদের পূর্ব-বার্তা বয়ে আনে, পুবদিকের হাওড়ের বুকে তখন পাহাড়পুর কিংবা ময়নামতির মতো পুরালিপি উদ্ভাসিত হতে থাকে। কিন্তু পাহাড়পুরও নয়, কিংবা নয় ময়নামতি। পুরালিপির থেকে যোজন দুরে তার স্থাপত্য-রহস্য। বরং তাকে বলা যায় নগরলিপি। বর্ষার পানির তোড়ে পরিত্যক্ত ইটের ভাঁটার বেদীগুলো তখন একটা একটা করে মাথা তুলতে থাকে। আরো পরে সেসব বেদীর উপরে চিমনি বসতে শুরু করে—একটা, দুটো, দশটা, বিশটা, এরপর শতাধিক। দিগন্ত পর্যন্ত যতখানি চোখ যায়, ঢাকা নগরীর মায়াবী দালানের সারির আগে ধোঁয়া-ভরা চিমনি। যেন এক অতিকায় জাহাজ প্রান্তর জুড়ে শুয়ে আছে। জাহাজ, অথচ পানির যার এতটুকু প্রয়োজন নেই। শ্যামনগরের রহমতেরা যখন হাওড়ের পানি বিদায় নেবে বলে মুহ্যমান থাকে, তখন এইসব ভাঁটার মালিকেরা তীব্রভাবে অপেক্ষা করে কবে পানি নামবে, আবার ভাঁটায় আগুন চড়বে। অথচ সবাই জানে, বন্যার পানিতে রহমতদেরই যত ভয় যেন।

রহমতের এই বিকার একভাবে ইটের ভাঁটা দেখে দেখেই শুরু হয়েছিল। জয়মন বলত অন্য কথা। এমনকি অন্য অনেকেই বলত—

'ভাঁটা বসছে, কামও তো পাইতেছি।'

'এতো ইবলিশের কাম। রক্তচোষা। মাটি ব্যাবাকটি খায়া ফালাইতেছে না? এই মাটিতে মানুষ থাকতে পারবে? আর শরীল? শরীলের কোনো তাল থাহে এইহানে কাম করলে?'

‘তুমার এতদিকে তাল ক্যা? তুমি মনে লয় দারোগার কাম করতে চাও।”

কথাবার্তা বিশেষ আগায় না। রহমত এদের সঙ্গে শরিক হতে পারে না। সে এদের সঙ্গে ট্রাকের মুটে হতে যায়, এমনকি ইটের ভাঁটায় যায়। কাজ করে, ফিরে আসে। আর জয়মনের সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলে। এই হচ্ছে শ্যামনগরের জীবন। রহমতের, জয়মনের, এবং আরো অনেকের।

যে আশ্বস্তিতে তার অবধারিত সখারা তাকে রাখবার চেষ্টা করে সেই আশ্বস্তি রহমত জয়মনের কাছে পেতে চায় না। রহমত চায় সমর্থন। রহমত চায় তার যে উৎকণ্ঠা আকণ্ঠ তাকে নিমজ্জিত রাখে প্রত্যহ—সকালে, কর্মদিবসে, দিবাবসানে, এমনকি নিদ্রামগ্নতায়ও—সেই উৎকণ্ঠা অন্যদেরকেও ঘিরে ফেলুক। উদ্বাস্তু হবার শঙ্কা আর বিক্ষোভ ওদেরকে অস্থির করে দিক। রহমতের অস্তিত্বের সেইটাই তখন সবচেয়ে গ্রাহ্য দিক। বলা যায় রহমতের জীবনের ঘোষণাপত্র রচিত হচ্ছিল এভাবে। অথচ জয়মনও ছিল নিরুপায়। জয়মন আর যে-কারোর থেকেই সম্ভবতঃ ভাল জানে উৎকণ্ঠার এই ঘোষণাপত্র সংক্রামিত হয় মানুষ থেকে মানুষে, অভিব্যক্তি থেকে অভিব্যক্তিতে, জীবন থেকে জীবনে। এই সংক্রমণের আশু বাস্তবতায় তার জন্য জরুরি ছিল নিজের, সন্তান ও রহমত সমেত, জীবনকে রক্ষা করা। সংক্রমিত উৎকণ্ঠার-জীবন প্রত্যাখ্যান করেছিল জয়মন।

এভাবেই, নিছক অন্তর্গত সংবেদ আর সংঘর্ষগুলো নিয়ে, ঢাকার উপকণ্ঠে বিবর্ধিত হয়ে চলেছিল ইটের ভাঁটারা। সেগুলোর নির্গত ধোঁয়ার পটভূমিতে ঢাকা নগরকে আরো মায়াবী আরো স্বপ্নালু দেখায়। রহমতের প্রাত্যহিক কর্মকাÊ দেখলে আর মনে হয় না সে ওখানে আছে। মনে হয়, সে ছুটি নিয়েছে, অবকাশে তার কাজ করে যাচ্ছে। তার সেই আপাতঃ বিযুক্তির আকস্মিক অবসান ঘটে যখন শীতের শুরুতে অগাধ অশান্ত লঘুগর্ভ হাওড়ের জলরাশিরা বিদায় নিচ্ছে আর একদিন কোথা থেকে এক দঙ্গাল মাটি ফেলার মেশিন এসে ঘিরে ফেলল হাওড় খানা। তোড়জোড় করে কাজ শুরু হলো। বসুমতি আবাসিক প্রকল্প।

আকস্মিক এক সকালে যে মেশিনগুলো এসে হাওড়ের মধ্যখানে মাটি কাটতে ও ফেলতে শুরু করে সেগুলো বসুমতি আবাসিক প্রকল্পের। এর অনেকদিন আগেই, হাওড়ের মধ্যে তখনও জলের স্রোত, দুইখানা বাঁশের উপর পেল্লায় একটা সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছিল—‘বসুমতি আবাসিক প্রকল্প’। রহমতের স্বল্পাক্ষর জ্ঞানে সেটার গুরুত্ব অনেক ঠাহর হয়নি কখনো। কেবল তার কোশাখানা পাশ দিয়ে নিয়ে যাবার সময় প্রায়ই সে ভুরু কুঁচকে তাকাত এই বাঁশজোড়া আর সাইনবোর্ডটির দিকে। আবার দু’ বৈঠা এগিয়ে যেত যখন লব্ধ-বিযুক্তিবোধে সে ভুলে যেতে চাইত এই আখ্যান। কিন্তু প্রতিবারই সে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেত। তার উৎকণ্ঠাটা আবার কণ্ঠনালীকে রুদ্ধ করে দিতে চাইত। কিন্তু রহমত ভয়ও পেত। সে ভয় পেত এই ভেবে যে আবার তাকে নতুন একটা আলাপ-প্রসঙ্গকে গড়ে তুলতে হবে। আবার তার একমাত্র ভাবনা-সঙ্গী জয়মনের বিরুদ্ধ-মুখাবয়বের সামনে তার বসতে হবে। রহমত আপ্রাণ চাইত এসব ভুলে যেতে। চাইত যাতে জয়মনের দৈনন্দিন শান্তিটুকুর সে অযথা শত্রু না হয়ে পড়ে। চাইত জয়মনের সঙ্গে সেই খুনসুটির দিনগুলোতে ফিরে যেতে। রহমত নিষ্ঠার সঙ্গে বরাবর এটা চেয়েছে।

কিন্তু প্রত্যহ কাজে যাবার পথে, কিংবা ঘরে ফিরবার কালে, সেই মেশিনগুলোর দাম্ভিক গর্জন আর পিচ্ছিল বিগলিত কাদার স্রোত রহমতকে সচকিত করে দিত। রহমত তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মনোসংযোগ হারিয়ে ফেলত। শয়ে শয়ে লোক তখন মাটি ফেলতে ব্যস্ত। সকলেই রহমতের মতো রোজকামলা। মেশিনগুলোতে সিগারেট-হাতে তদারক করছে অন্য কিছু মানুষ। রহমতের সব ভোজবাজি মনে হয়। এই বিপুল গতির মহাযজ্ঞে রহমত তার প্রাত্যহিক ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলে। প্রতিটা সকালেই আতঙ্কিতভাবে প্রায় চোখ-বুঁজে সে বিগত-হাওড়ের মধ্যখানে আসে। কারণ সে জানে চোখ খুললেই ম্যাজিকটার আরো প্রকট একটা চেহারা দেখবে। রহমত এবং অন্য সকলের চোখের সামনেই

এই ম্যাজিকটা দানা বাঁধছিল। রহমতের ইচ্ছে হয় ভোজবাজিকরকে টেনে নিয়ে সামনে আসে। সকলের সামনে তাকে উন্মুক্ত ক'রে তার ক্ষমতা লুপ্ত করে দেয়। এরকম ভাবতে ভাবতে ওর মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ তৈরি হয়। কাজ থেকে ঘরে ফিরবার পথে এই আওয়াজটাকে তাড়াতে তাড়াতে, ওর ঐকান্তিক নিষ্ঠাটাকে ফিরে পাবার চেষ্টাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ঘরে ফিরলে ওর সেই পরিশ্রান্তিকেই অন্যের ভারি অচেনা লাগে। মনে হয় রহমত আরো দুরে কোথাও অভিযাত্রার স্বপ্নে তন্ময় হয়ে আছে। কিংবা একরোখার মতো সেই অভিযাত্রা বুনছে। বলাই বাহুল্য, জয়মনের আরো সন্ত্রস্তই লাগতে শুরু করেছিল।

ছয় মাসের বেশি লাগেনি বসুমতি প্রকল্পের বিরাট জমি তৈরি হতে। সেই জমানো-মাটির চাঁতাল তখন এতটাই উঁচু যে ভরবর্ষার হাওড়ও সেখানে উঁকি মেরে দেখতে পাবে না। একটা সংযোগ পথ তখন আরিচা-মহাসড়কে এসেছে। ততদিন সেই পথটুকু খসড়াভাবে পিচে বানানো। বসুমতির জমিতে গাড়ি আসে। ভেতরে অনেকগুলো ইট আর টিনের ঘর তৈরি হয়েছে। ঠিকাদারদের কর্মচারিরা তখন সেখানে থাকতে শুরু করেছে। আর অনেকগুলো কলাগাছ এরই মধ্যে বড় হয়ে গেছে। আর নানারকমের গাছের চারা। রহমত জানে কলাগাছগুলো একটা ধোঁকাবাজি। এগুলো থাকবে না। কেবল তাড়াতাড়ি বাড়ে বলে লাগানো হয়েছে। দুর থেকে দেখে আর বোঝা যায় না এই জমিখানাই কদিন আগে হাওড় ছিল। রীতিমতো অশান্ত লঘুগর্ভ হাওড়। রহমত আরো জানে বসুমতির বাসিন্দারা এসে পড়বার সময় হয়েছে।

তাই রহমত মাটির সঙ্গে কথা বলতে রাত্রিবেলায় বের হয়। রহমতের দেরি হয়ে যাচ্ছিল। ও জানত বসুমতির বাসিন্দারা চলে এলে এই আলাপটুকুও ওর সারা হবে না। সবাই যখন ঘুমায় চৌকির কিনার থেকে আলতো জোড়া পায়ে রহমত মাটিতে নামে। আড় চোখে জয়মন তাকে দেখে। সে দেখে না। প্রথম দিন জয়মন তাকে ডেকেছে। তারপর বিছানা ছেড়ে পায়ে পায়ে রহমতের পিছু পিছু অবাক-চোখে হেঁটেছে। জিজ্ঞেস করেছে। এইসব জাগতিক সাংসারিক সম্বোধনে রহমতের কোনো তোয়াক্কা নেই তখন। নৌকাটাকে ঘাট থেকে ঠেলে তাতে চড়ে বসে রহমত। তারপর বসুমতিতে পোঁছে মাটির বুকে প্রগাঢ় এক চুম্বন আঁকে। তার ঠোঁট নরম কাদায় মাখামাখি হয়ে যায়। হাওড়ের জননকেন্দ্র হতে যে মাটি বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন সেই মাটি হাওড়ের বুকে শ্বাসরুদ্ধ করে বসে আছে। সেই মাটির নাড়ির টান শোঁকে রহমত। সেই মাটির কৃতজ্ঞতা মাপে রহমত হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে। কান পেতে শোনে কোথাও কোনো ক্রন্দন উৎসারিত কিনা। এভাবে সমস্ত বসুমতির নরম মাটিতে রহমত তার অনুসন্ধান চালায়। সুবে-সাদিকের আকাশ যখন রহমতের শরীরে নূরের আলো ফেলে, সে নৌকায় ফিরে আসে। একবারই কেবল ঠিকাদারদের লোকেরা চোর চোর বলে চেঁচামেচি করেছে। রহমত সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করেনি।

প্রথম রাতে রহমতের এই অভিযাত্রার সাক্ষী ছিল জয়মন। তারপর প্রতিরাত। এরই মধ্যে সে এক বৃহস্পতিবার রাতে আলীর মাজারে গেছে এক প্রতিবেশিনীর সঙ্গে। রহমতের জন্য একটা তাবিজ নিয়ে এসেছে জয়মন। কোনো সন্ধ্যায় তেল মাখিয়ে দেবার কালে সেই তাবিজটা রহমতের গলায় পরিয়ে দেয় সে। রহমত তাবিজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল হাতে নিয়ে। কিন্তু কোনো কথা জিজ্ঞেস করেনি। জয়মনই বলে। প্রতি সন্ধ্যায় যে তেল মালিশ করে জয়মন, তার প্রত্যাশা সেই তেলও রহমতের বিকার সারিয়ে তুলবে। আর রহমত রাগী ষাঁড়ের মতো রুদ্ধ হয়ে বসে থাকে। যেন জয়মনের সোহাগের কারণেই সে বসে আছে। যেই মাত্র তার তেল লাগানো শেষ হবে অমনি সে সম্মুখ চরাচার বিদ্ধ করতে ক্ষিপ্ত একটা ছুট লাগাবে। তেল লাগানো শেষ করে জয়মন রহমতের গলায় কালো-তাগায় ঝোলানো তাবিজটাতে চুমু খায়। তখন রহমতও সেটাতে চুমু খায়। আর তার অভিযাত্রার অজ্ঞ অথচ ভরসামান সাথির দিকে স্পষ্ট করে তাকায়। এই একবার।

রহমতের অভিযাত্রা চলতে থাকে। তার অনুসন্ধান চলতে থাকে। দিনে দিনে হাওড়ে জলরাশি স্ফীত হয়। ভরবর্ষায় সেই জলরাশি বসুমতির হঠাৎ মাটিতে চমকে ওঠে। ছলকে ছলকে পড়ে। নিতান্ত অনিচ্ছা আর বিক্ষোভ সমেতও যে দিনগুলোতে রহমত কাজে যায়, নিশ্চুপভাবেই, সেই দিনগুলোতে এই ছলকে-পড়া পানি দেখে তার পরান মোচড় দিয়ে ওঠে। তার ইচ্ছে হয় এই জলেদের কাছে গিয়ে কানে কানে বলে নাড়ি-ছেঁড়া মাটির আর্তনাদের কথা।

একদিন সুবে-সাদিকে বাড়ি ফেরার পথে রহমত কর্তব্য শনাক্ত করে। কৃতসংকল্প হয়। এবং বার্তা বিনিময়ের প্রয়োজন যেহেতু ওর জীবনে আর নেই, ওর কাউকে বলাও হয় না সে কথা।

অমাবস্যাস্নাত একঝাঁক নক্ষত্রকে সাক্ষী মেনে রহমত বসুমতি আবাসিক প্রকল্পের জমির দিকে ছুটছে। পাগলাটে বাতাসটাকে সে শাপশাপান্ত করে। শক্ত হাতে সে বাঁশের লগিটা আঁকড়ে ধরে। সম্মুখে তার যেতেই হবে। আর সম্মুখের বাতাসটা তার গায়ে কাঁপন ধরিয়ে দিলে সে ডানহাত লগি থেকে সরিয়ে তাবিজটা মুঠো করে ধরে।

'আল্লাহু আকবার!' তাবিজে লেখা এই নাম সে চিৎকার করে পড়তে থাকে।

তার কর্তব্যবোধ শরীরে ঘোড়ার মতো শক্তি এনে দেয়। সে আবারো চিৎকার করে—

'আল্লাহু আকবার!'

তার ব্রত ছোট্ট এই নৌকাটাকে মাছের মতো ক্ষিপ্র করে দিয়েছে। ওই তো সম্মুখে বসুমতির জমি দেখা যায়! রহমত উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। নৌকাটাকে সোজা করে ধরে রাখে। পাগলাটে বাতাস তার ঐকান্তিক সংকল্পের কাছে বশ মেনে স্তিমিত হয়ে আসে। সে টের পায়। তার মনে হয় এই যুদ্ধে সে যেন কুমিরের পিঠে সওয়ার। কুলকুল করে চতুষ্পার্শ্বে জল কেটে যাচ্ছে। এই তো একেবারে সন্নিকট বসুমতির মাটি! বসুমতির মাটি বিদীর্ণ করে হাওড়ের বুকে মিশিয়ে দিতে রহমত খাড়া নৌকা চালিয়ে দেয়।

পরদিন।

পরদিন বসুমতি আবাসিক প্রকল্পের ঠিকাদারেরা রহমতকে পায় পেছনে শানবাঁধানো গ্যাসের লাইনের বেদীতে। সারা শরীরে হাওড়ের পানি ঢুকে রহমতকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অতিকায় বানিয়ে দিয়েছে। সকলেই দেখতে আসল। বসুমতির ঠিকাদারেরা লাশ দেখতে আসল। শ্যামনগরের বাসিন্দারা লাশ নিতে আসল। তাদের সঙ্গে জয়মন। কিন্তু শ্যামনগর বা বসুমতির কেউই জানতে পারল না রহমত বসুমতির মাটিকে বিদীর্ণ করে হাওড়ে মিশিয়ে দিতে এসেছিল। সেইদিন পারল না তারা। এমনকি এতদিনেও পারেনি যখন বসুমতি আবাসিক প্রকল্পের বাড়িগুলো সব সারি সারি দাঁড়িয়ে।

আর বসুমতি আবসিক প্রকল্পের কোনো বাসিন্দাই রহমতের নাম জানে না।

ময়নাতদন্তহীন একটি মৃত্যু

ধনরাজ আর শাহাবুদ্দিন ল্যাটকা মেরে বসে ছিল। আধমরা কতগুলো ফুলের গাছ লাগানো আছে জেনারেল ওয়ার্ডের পাশ ঘেঁষে, আর লোহার গেটটা পর্যন্ত। কয়েকটা মোরগফুলের গাছে নারকেলের জমাট ছোবড়ার মত ফুল ধরে আছে। ভাল করে না দেখলে মানুষের গুয়ের মত দেখায়। এপাশে খান তিনেক দুপুরমণির গাছ গোঁয়ারের মত বেঁচে আছে। পাতাবাহারের গাছ চারটা দীর্ঘদিন কাঁচির অভাবে ডাঁটাশাকের গাছের মত ধিঙি। সেই বাগানটাকে ইটের চাঁতাল করে ঘেরা। সেখানে পাছা পেড়ে পা মেলে দিয়ে বসে ছিল শাহাবুদ্দিন। আর দুই হাঁটু ভাঁজ করে সেখানে মুখ আর গলার গামছাখানা একত্রে গুঁজে রেখে বসে ছিল ধনরাজ। দুজনেরই দৃষ্টি জেনারেল ওয়ার্ডের বারান্দায় যেখানে ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিল জনা তিনেক লোক। পেছনে নেহায়েৎ হুকুমসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে নিরুপায় দুজন কনস্টেবল পুলিশ। কথা বলছিল যে তিনজন, তাদের একজন মাঝারী বয়সের পুরুষ। সে-ই হাত নেড়ে অনেক কথা বলছিল। আর ওসি সাহেব মাথা নাড়ছিল। দুর থেকে সম্মতি মনে হয়। মনে হয় ধনরাজদেরও। সেদিকে তাকিয়েই তারা ল্যাটকা মেরে বসে ছিল। কথা শেষ করে দুজন পুলিশ সমেত ওসি উঠল গিয়ে ডাইহাটসু জীপে, ওয়ার্ডের পাশের ন্যাড়ামাঠে রাখা। তারপর জীপ ঘুরিয়ে হাসপাতালের মরচে ধরা লোহার গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল, ধনরাজদের একেবারে কাছ দিয়ে।

জীপটা বেরিয়ে গেলে শাহাবুদ্দিন ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়াল।

ছোট্ট শহরের সবকিছুই লাগোয়া। কেবল কলেজের পাশ দিয়ে যে সড়কটায় দুরপাল্লার বাসগুলো আসা যাওয়া করে সেখানে ধান আর গমের ক্ষেত, মৌসুমে ছোলা কিংবা মুসুরি। যখন দিকভ্রান্ত বাতাসেরা শহরের ভেতরে ঢুকব ঢুকব করেও না ঢুকে পাশ দিয়ে চলে যায়, যাবার কালে সেই সব ক্ষেতের উপরে আলতো করে ছোঁয়া রেখে যায়। আর ধানের, গমের কিংবা ছোলার কচি দেহগুলো তিরতির করে কাঁপতে থাকে সেই বাতাসে। দুধের সরের মতো কাঁপন তাদের। সে কাঁপন দেখে দলছুট যে বুলবুল একমনে খুঁটির উপর বসে ছিল সে উড়ে অন্য কোথাও যায়। ধনরাজ কিংবা শাহাবুদ্দিনের দিন কেটে যায় তাই দেখে। তাই দেখে দেখে ওরা ঘুমিয়ে পড়ে, অবেলায়। আবার অবেলাতেই ঘুম থেকে ওঠে। যা কিছু কাজ ওদের তা সব রাত্রিবেলাতেই বেশি।

লাশ-কাটা ঘরখানা সরকারী। কিন্তু অন্যসব সরকারী অফিস থেকে কিছু দুরে। একটা তিন কামরার একতলা বাড়ি। দরজাগুলো দুই পাল্লার। এতগুলো বছরের গাঢ় স্মৃতিতে সেগুলো ভাঁজে ভাঁজে মিশ খায় না। ঠেসে ধরে লাগাতে হয়। তবে লাগানোর তেমন রেওয়াজ নেই। লাশ আসে লাশ যায়। লাশেরা সওয়ার হয়ে আসে, সওয়ার হয়েই যায়। ধনরাজরা কেবল কেউ না কেউ থাকেই ওখানে। জানালার পাল্লাগুলোর খাবলা উঠে গেছে। লোহার সমান্তরাল শিকের দুয়েকটি উধাও। যেগুলো টিকে আছে সেগুলোর নিচের দিক ক্ষয়ে গেছে। প্রায় আগরবাতির মতো দেখায়। বাইরের দেয়ালে কোনো এক কালে লাল রং করা হয়েছিল। আর এই ঐতিহ্যকে বরাবর রাখতে এখন চল্টা ওঠা দেয়ালেও একপ্রস্থ লাল রঙ লাগিয়ে যায় রঙের কর্মচারিরা। তারই মাঝখান থেকে বেয়াড়া রকমের বেঁচে-থাকা অশ্বত্থের তিনখানা গাছ তিন প্রান্ত থেকে অহেতু এক প্রতিযোগিতায় বাড়ছে। ভেতরের দেয়াল সাদা। সেই সাদা দেয়ালে রক্ত, পানের পিক, অসতর্ক কাশির শুকনো অবশিষ্ট, আর নিছক মনোযোগে আঁকা কয়লার ফুল-লতা-পাতা। বাইরের বৃষ্টিরা অবাধ ভেতরে ঢুকতে পারে না—এই যন্ত্রণায় দেয়ালটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ঢ্যাবসা হয়ে গেছে। সেই সোঁদা দেয়ালে কয়লা-শিল্পীর কসরৎ করে আঁকশিল্প জারি রাখতে হয়। তথাপি এভাবেই অলস কর্মহীন কোনো রাত্রে সে এঁকে যায়। লাশ-কাটা ঘর বলেই বোধহয় এই স্বাধীনতায় কোনো হস্তক্ষেপ হয় না এই সরকারী ভবনে। তিন কামরার একটিতে পাশাপাশি দুটো তক্তপোশ পাতা। নিমকাঠের কাঠামো লালচে হয়ে আছে। আর ওপরে আমকাঠের ছাউনি পেরেকের নিষ্ঠুরতায় ঠিকমতো বেঁকে উঠতে পারেনি। এরই মধ্যে

ধনরাজ কিংবা শাহাবুদ্দিন, কিংবা মহারাজ, রামগোপাল, কার্তিক, আর মোফাজ্জল ঘুমিয়ে কাটায়। রাতে ঘুমায় যখন প্রায়শই মধ্যঘরে রাখা টিনের দেরাজে কোনো না কোনো নিষ্প্রাণ অতিথি ঘুমায়। বিক্ষত তাদের দেহ কিছুমাত্র অস্বস্তিতে ফেলে না এদের। বরং নিয়মিত লোডশেডিং-এ ষাট ওয়াটের টিমটিমে বাতিটাও যখন জ্বলে না, সেই অন্ধকার রাতে মায়াবী এক আবিষ্টতা ঘরটাকে ঘিরে রাখে। ধনরাজদের সেই মায়া আর কাটানো হয় না।

ঠিক কবে এই বাড়িটা বানানো হয়েছিল এবং কী উদ্দেশ্যে তা বলবার মতো কেউ নেই। ধনরাজ জন্মানোরও ঢের আগে ওর বাবা এই কাজই করেছে। ধনরাজের বাবাই বা কোত্থেকে এসে এই লাশকাটা ঘরের সম্রাট হয়েছিল সেও এক রহস্য। কিন্তু ধনরাজ কিংবা ওর ভাই মহারাজ ছোটবেলা থেকেই জানত যে এই কাজে তালিম নেয়া তাদের কর্তব্য। সেই কর্তব্যে এতগুলো বছরেও কিছুমাত্র সংশয় দেখা দেয়নি, দেখা দেয় না।

ধনরাজরা জানে যে ওরা সরকারী কর্মচারি। কিন্তু সেই কথা তিরতির করে কাঁপতে-থাকা ধানগাছের শরীর দেখবার কালে তাদের আর মনে পড়ে না। এমনকি মনে পড়ে না যখন রাত্রিবেলা অপর্যাপ্ত আলোর মধ্যে দু'জন মানুষ চারপাশ থেকে তাগাদা পায় তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্য, আর ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে থাকে টেবিলের ওপর শায়িত মরদেহের সঙ্গে। হাসপাতালের লোকেরা আসে, আবার চলে যায়। ডাক্তারদের আসারও কথা। তারাও আসে। সুবিধামত। আবার চলে যায়। শক্ত বাদীপক্ষ না থাকলে ডাক্তারদের কাজটা এমন কিছু না। পুলিশেরা আসে। তারা অত সহজে যায় না। মরদেহের কিছু একটা ফয়সালা করে তারপর যায়। কেবল প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে ধনরাজরা আদালতের কেরাণীর কাছে বেতন আনতে যায়। কেরাণী তাদের নাম ডেকে ডেকে বেতন দেয়। তখন ওরা সবাই একত্রেই যায়। সেটাই নিয়মের মতো হয়ে গেছে।

'মহারা আ আ জ'

'জ্বি'

'ধনরা আ আ জ'...

'রামগোপা আ আ ল'...

'কার্তি ই ই ই ক'...

এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা যে আদালতের কেরাণীর পক্ষে এত জোরে না ডাকলেও চলে। এ নিয়ে ভেবেছে ওরা। কিন্তু এই একটা দিনে লাশ-কাটা ঘরের বাইরে তাদের নামগুলো প্রকাশ্যে যখন ঘোষিত হয় তখন একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করে ওরা। এই নামগুলো এখন ওরা এরকম জোরেই এদিন শুনতে চায়। কেবল শাহাবুদ্দিন বা মোফাজ্জলকে ডাকবার সময় প্রায় প্রতিবারই কেরাণী স্বরবর্ণে মনোনিবেশ না করে ব্যঞ্জনবর্ণে হোঁচট খায়।

'শাহাব... উদ্দিন... কীরে মুসলমানের ছেলে লাশকাটতে আসলি কেমনে?'

এমন নয় যে প্রতিমাসেই প্রশ্নটা করে কেরাণী। কিন্তু মাঝেমধ্যেই করে। আর শাহাবুদ্দিনও প্রথম প্রায় না-জানা উত্তরটাই হাতড়ে হাতড়ে দিতে চেষ্টা করত। এখন অবশ্য বুঝতে পারে উত্তরটা দেবার বিশেষ আবশ্যকতা নেই। কেরাণী চায় শাহাবুদ্দিন জানুক তার আর ধনরাজের মধ্যে বিশেষ ফারাক আছে। কিংবা জানুক ধনরাজ। কিন্তু ফারাকটা ভাল করে শাহাবুদ্দিনের কখনোই বোঝা হয় না। বিশেষতঃ যখন শিকভাঙা জানালা দিয়ে সামনের বিস্তরণশীল ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকে সে, আর পাশের তক্তপোষে ধনরাজ উপুড় হয়ে লালা-ঝরানো অঘোর ঘুমিয়ে—কিছুতেই শাহাবুদ্দিন বুঝতে পারে না। কেবল আবছাভাবে মনে করতে চেষ্টা করে কবে কোন অদৃষ্ট রহস্যে কৈশোরে লাশকাটা ঘর দেখতে সে এসেছিল। তারপর কীভাবে এখানেই থেকে গেছে। হয়তো আর কোনো কাজ ও করতেই পারত না!

কিন্তু ধনরাজ বা শাহাবুদ্দিনের জগতে এই দিনটা, কিংবা দিনটাকে ঘিরে যে দেনাপাওনা, তার পুরা মাহাত্ম্য কখনোই স্পষ্ট হয় না। যখন বেতন হিসেবে কুড়ি টাকা পায় ওরা তখন একটা স্তম্ভিত ফ্যালফ্যালে অনুভূতি তৈরি হয়। বহুক্ষণ সেই টাকাটা কোথাও গুঁজে রাখতে ভুলে

যায় ওরা। যে যার নোটের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে কেরাণীর ঘর থেকে। আবার ওরা টের পায় এই টাকাটা ওদের কাজের স্বীকৃতি। এমনকি হয়তো একমাত্র স্বীকৃতি যে ওরা সরকারের জন্য কাজ করছে। ওরা এমন একটা কিছু করছে যেটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কিছুতেই ওরা বুঝতে পারে না সেটা এমন চোরের মতো সন্তর্পনে লুকিয়ে রাখতে হয় কেন। কেন অনায়াসে আর পাঁচজনে ওদের সঙ্গে পাঁচ-দশটা প্রাত্যহিক আলাপ করে না। কিংবা লাশ-কাটা ছাড়া আর কীইবা করতে পারত তারা। এই সংশয়ের ঘোর অন্য দিনগুলোতে, বিশেষতঃ যখন পেশাগত ব্যস্ততায় কাটে, তাদের মনে অনেক দাগ কাটে না। মাসের তিন, চার বা পাঁচ তারিখে বেতন তুলতে গেলে এটা প্রতিবারেই সামনে চলে আসে। অনেক আলাপ তাদের মুখে আসে না। বরং তারা হাতে-পাওয়া নোটটা নাড়তে নাড়তে প্রত্যেকেই আলাদা করে ভাবতে থাকে। তারপর ফিরে আসে। আবারো তাদের কাজে। এই তিন কামরার দুরবর্তী অফিসে।

তবে হিসেব করে দেখলে বোঝা যাবে ধনরাজদের আয় কেবল মাসকাবারি বেতন এই কুড়ি টাকা নয়। ওরা লাশের মালিকপক্ষ থেকেও পয়সা পায়। লাশের মালিক তো আর লাশ নিজে হতে পারে না! তাহলে ওদের পাবার কোনো আশা থাকত না। কিন্তু লাশের মালিক পক্ষ থাকে। তারা লাশপ্রতি পঞ্চাশ টাকা এমনকি একশ টাকা পর্যন্ত দেয়। একবার মোহনপুরের এক লোক এসেই পাঁচশ টাকা ধরিয়ে দিয়েছিল ধনরাজের হাতে। ধনরাজ ভালরকম ঘাবড়ে গিয়েছিল প্রথম। সেদিনও শাহাবুদ্দিন ছিল। ধনরাজ হাতে টাকাটা পেয়ে শাহাবুদ্দিনের দিকে তাকায়। দুজনেরই মনে হয়েছে কোনো ঝামেলা আছে মামলায়। ওদের বিস্ময় আর চেপে রাখতেও পারেনি।

'পাঁচশো টাকা!'

'এই তো শেষ। আর তো কোনো খরচ নাই।'

কথাগুলো বলতে বলতে লোকটা কেঁদে ফেলেছিল। সেবার লাশ কাটতে গিয়ে কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল ধনরাজদের।

এই বখশিস নেয়া নিয়েও অনেক ভেবেছে ওরা। মরা মানুষের ওপর বখশিস নেয়া ওদের ঠিক মনে হয় না! কিন্তু ওদের এই ভাবনার অনেক ফুরসৎ থাকে না। যখন বেলার পর বেলা, দিনের পর দিন একটা লাশ আসে না বলে লাশ-কাটা ঘরের মধ্যে অলস বসে থাকে, ওরা অনুভব করে এক তীক্ষ্ণ অপেক্ষার ভার। তারপর সচকিত হয়—লাশের জন্য অপেক্ষা করছে এই ভেবে। তাও অপঘাতে মৃত্যু! গ্লানি বোধ করে। পরিতাপ বোধ করে। কিন্তু পরের প্রহরে আবার অপেক্ষা করে। এই চক্র থেকে অনায়াসে মুক্তি ওরা পায় না।

তক্তপোশে ঘুমিয়ে পড়েছিল ধনরাজ। শাহাবুদ্দিন সকাল থেকে লাপাত্তা। একটা তক্ষক সেই সন্ধ্যা থেকে শিকভাঙা জানালার ওধার থেকে ডাকছিল। জানালার ধারে গিয়ে ধনরাজ খামকাই তক্ষকটাকে দেখার চেষ্টা হরে। বিকেলের আলো যখন সবটা শুষে নিল রাত, ধনরাজের বুকটা আচমকাই খালি লাগতে থাকল। তখনই ওর তক্ষকের ডাকটা নিদারুণ কর্কশ লাগতে শুরু করে। একবার ভাবল গৌরীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসে। কিন্তু ওর গায়ে বেশ ব্যথা। ধনরাজ ভাবছিল জ্বর আসবে বুঝি। তক্তপোশে গুটিসুটি মেরে শুয়ে ধনরাজ বাসায় যাবে নাকি শাহাবুদ্দিনের জন্য অপেক্ষা করবে তাই ভাবছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

সারাটা ঘর আগরবাতির গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে আছে। সেই গন্ধে ধনরাজের অবশ অবশ লাগে। ও ঘুমিয়ে পড়ার জন্য খুঁজে একটা বালিশ বের করে। আর কোথা থেকে শাহাবুদ্দিন এসে ধনরাজকে বোঝাতে শুরু করে এখন কিছুতেই ঘুমিয়ে থাকা যাবে না। ওর নাকি টেবিলে গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে। আর দুর থেকে 'টক্কা টক' 'টক্কা টক'—খুব আজব ধরনের ঢাকের বাজনা শুনতে পায় ধনরাজ। সে কথা সে শাহাবুদ্দিনের কাছে জানতে চায়। শাহাবুদ্দিন শুকনো মুখে থাকে। এসবের কিছুই উত্তর করে না। কেবল ধনরাজকে পীড়াপিড়ি করে টেবিলে গিয়ে শুয়ে পড়তে। অথচ ধনরাজের টেবিলে গিয়ে একটুও শুতে ইচ্ছে করছে না। ওর ভীষণ ভয় করছে। আর সেই ঢাকের আওয়াজটা ক্রমশঃ বাড়ছে। ধনরাজের তখন সবকিছু কেমন

এলোমেলো লাগতে থাকে। ওর মনে হয় শাহাবুদ্দিন এর সবকিছুই জানে। শাহাবুদ্দিনকে সে জোর করতে থাকে। 'আমি ঘুমাব'। শাহাবুদ্দিন তাকে বলে সে নাকি মরে গেছে, তাই টেবিলে শুতে হবে। এরপর সে জোর করে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যেতে চায় ধনরাজকে।

শাহাবুদ্দিন ঢুকেই ধনরাজের কপালে হাত দেয়। গরমে পুড়ে যাচ্ছে ধনরাজের গা। শাহাবুদ্দিন নিজের বিছানা থেকে কাঁথাটা এনে ধনরাজের গায়ে দিতেই ধড়মড়িয়ে ওঠে সে। শিকভাঙা জানালার বাইরে কাঁঠাল গাছটার ধারে তখনো তক্ষকটা ডাকছে—'টিক্ কো, টিক্ কো, টিক্ কো। গত একটা সপ্তাহ ধরে যে লাশের জন্য অপেক্ষায় আছে ওরা, অন্ধকারে শাহাবুদ্দিনের মনে হলো সেই লাশই বুঝি ধনরাজ। সুইচ টিপে ষাট ওয়াটের বাতিটা জ্বালায় ধনরাজ। সদ্য ঘুম ভাঙা টসটসে লাল ঘোলাটে চোখ দেখলে কোনো জীবিত মানুষ মনে হয় না। কলসি থেকে মগে পানি ঢালে শাহাবুদ্দিন। হাতে সেই পানি নিয়ে ছিটিয়ে দেয় ধনরাজের চোখেমুখে। ধনরাজ খানিক ধাতস্থ হয়।

'স্বপন দেখিছি।'

'তোর তো জ্বর দেখি।'

'না জ্বর টর কই।'

ধনরাজ খানিক বিব্রত হয়। শাহাবুদ্দিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর ইচ্ছা করে স্বপ্নের পুরা কাহিনীটা বলে। কিন্তু গুছিয়ে বলতে আর ইচ্ছে করছে না। আর এই স্বপ্নের কোনো মাথামুণ্ডুও ও পায় না।

'বাড়ি যাবি?'

শাহাবুদ্দিনের আকস্মিক প্রশ্নে ধনরাজ কথা খুঁজে পায় না। হঠাৎ ওর ডুকরে কান্না চলে আসে। সেটা সামাল দিতেই মাথার কাছে পুটলি পাকিয়ে রাখা আঁশটে গন্ধের গামছাখানা দিয়ে মুখ মোছার ভান করে ধনরাজ। মাথা নেড়ে জানায় ভাল আছে, বাড়ি যাবে না। শাহাবুদ্দিন এরপর ভাল খবরটা দিয়ে ধনরাজকে চাঙা করবার চেষ্টা করে—

'হাসপাতালে বিষ-খাওয়া রুগি এসিছে।'

অনেকক্ষণ শাহাবুদ্দিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ধনরাজ। তারপর সম্ভবতঃ কথাটাকে এগিয়ে নিতেই জানতে চায়—

'কখুন?'

শাহাবুদ্দিন সেই কথার উত্তর করে না। ধনরাজের পাশে এসে বসে—

'এই রুগির টাকাডা তুই নিস। আমারি এবারি দেয়া লাগবি না।'

কিছুই আড়াল নয় জীবন তাদের। দিনলিপি গড়িয়ে গড়িয়ে শিকভাঙা জানালার এপাশ ওপাশ আসা-যাওয়া করে। আর পরস্পর উন্মোচিত হয়। ফলে যে জীবন এই লাশ-কাটা-ঘরের ধনরাজ বা শাহাবুদ্দিনের, বাইরের জীবনে সে জীবনের কোনো অননুপ্রবেশ্যতা নেই। সে জীবনে হাট হয়ে খুলে থাকে তারা। কেবল লাশ-কাটা ঘরে রাখা টিনের মরচে-পড়া দেরাজগুলোর মতো এই ঘরের এক খণ্ডজীবন আড়াল হয়ে থাকে। বাইরে থাকে, আর পরস্পরের কাছেও থাকে। কখনো কোনো অন্যমনস্ক নৈকট্যেও এই জীবনের পুঁথিপাঠ করতে বসা হয় না তাদের। রীতিবদ্ধভাবে তারা রাত্রির জন্য অপেক্ষা করে, লাশের জন্য অপেক্ষা করে, রাত্রিশেষে সকালের জন্য অপেক্ষা করে। আর দুরূহ একেকটি লাশ-কাটা শেষ হলে বখশিসের টাকার জন্য অপেক্ষা করে। সেই লব্ধ টাকার ভাগাভাগিটাও তারা রীতিবদ্ধভাবে সারে, তারপর যে-যার ঘরে ফেরে, সেই ঘর যেখানে লাশ-কাটা হয় না অথচ প্রতিটা সকালে লাশ-কাটা ঘর থেকে ফেরা জীবন্ত মানুষের জন্য প্রত্যাশা থাকে।

সেই রাত্রিতে অতঃপর, দুটি জীবন্ত মানুষ একটি লাশের জন্য অপেক্ষা করে চলে। বাইরের তক্ষক কোন কালে তার ডাক থামিয়েছে ধনরাজ বা শাহাবুদ্দিন তা লক্ষ্যও করেনি। দূরে জেলখানার ঘণ্টায় যখন রাত দুটোর ঘণ্টা বাজে, কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে-থাকা ধনরাজকে নিয়ে শাহাবুদ্দিন বাড়ির পথে রওনা হয়। ধনরাজের জ্বর বোধহয় আরো বেড়েছে।

ফজরের আজানও শুনতে পেল শাহাবুদ্দিন। তারপর পুবের আকাশ আরো ফর্সা হলে ধনরাজের বাসার দিকে রওনা দেয়। যে লাশ রাতে

এসে পৌঁছোয়নি সেই লাশ সকালেই আসবে হয়তো। গৌরী জানত যেন সকালে শাহাবুদ্দিন আসবে। ধনরাজের মতোই মুখ গুঁজে-থাকা ছোট্ট চালাখানার সামনে ততোধিক গুটিসুটি মেরে সে বসেই ছিল। গৌরীর ঘোলাটে চোখের দিকে শাহাবুদ্দিনের তাকাতে সাহস হয় না। গত ক'দিন ধরে শাহাবুদ্দিন শুধু মরা মানুষের মুখ দেখে—রাস্তায়, হাসপাতালের ওয়ার্ডে, কোর্টের সামনে দিনের বেলার জটলায়। শাহাবুদ্দিনকে দেখে হাসতে গেল গৌরী। শাহাবুদ্দিনের একটুও হাসি আসল না। ধনরাজ ওদের কথা শুনে বাইরে বেরিয়ে আসে। ওর চেহারা দেখে শাহাবুদ্দিন একাই হাসপাতালে আসতে চেয়েছিল। ধনরাজ তা শোনেনি।

হাসপাতালে এসে ওরা এমার্জেন্সিতে ঢুকতে পারেনি। গার্ড বলেছে পুলিশ আবার আসবে। লাশের লোকজন পুলিশের জন্য বসে আছে। শাহাবুদ্দিন আর ধনরাজ দুজনেই তাকিয়ে থাকে পরস্পরের দিকে। একটা আশঙ্কা ততক্ষণে শাহাবুদ্দিনকে ফ্যাকাশে করে দিয়েছে। আর ধনরাজের নিস্তরঙ্গ চোখ আরো স্থির আরো মৃতবৎ হয়েছে। পুলিশের গাড়ি ঢুকলে তারা এমার্জেন্সির মাঝারি কুঠুরিখানার কোণাকুণি ডান হাতে জেনারেল ওয়ার্ডের বারান্দাতে আসে। একটু পরে দারোগা রুগির আত্মীয় সমেত এদিকেই আসতে থাকলে ওরা ফুলের বাগানটার সামনে গিয়ে বসেছিল।

দারোগাকে চলে যেতে দেখে শাহাবুদ্দিন ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়ায়।

ধনরাজ তখনো গামছায় হাঁটুতে মুখ গুঁজে আছে। শাহাবুদ্দিন তাকিয়ে দেখে ধনরাজ কাঁপছে। ভয় পেয়ে বসে পড়ে ও। ধনরাজের গায়ে হাত দিতেই সে মাথা এলিয়ে দেয় শাহাবুদ্দিনের কাঁধে। কোনোমতে তাকে খাড়া করিয়ে বসিয়ে দিয়েই শাহাবুদ্দিন ছোটে এমার্জেন্সির গার্ডের সঙ্গে কথা বলতে। এ দফা এমার্জেন্সির গার্ডকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করতে হয় না শাহাবুদ্দিনের। ওকে দেখেই ঠোঁট উল্টে গার্ড বলে দেয় 'ফয়সালা শেষ।'

থুৎনিটা বুকের কাছে চেপে ধরে রেখে প্রাণপণে চোখ তুলে ধনরাজ তাকিয়ে আছে শাহাবুদ্দিনের আসতে থাকার দিকে। ওর আধবোঁজা চোখের দিকে তাকাল শাহাবুদ্দিন। সেই চোখ আরো বুঁজে আসছে। আর শাহাবুদ্দিন ধনরাজের দিকেই আসছে।

খবর নিয়ে।

দাড়ি কামাবার জন্য শুভক্ষণ

সরকারী কর্মকর্তারা তখন তাঁদের ব্লেজারের ফাঁকে কাঁপছেন। মাঘের শীত না যদিও, আমি ভেবেছিলাম তাঁদের অনেকেই চাদর-টাদর পরে জুবুথুবু হয়ে আসবেন। সেই সুযোগ ছিল। একেকটা দিন আসে বছরে টেলিভিশনে পর্যন্ত সেদিন পুরুষজনেরা স্যুটকামাই দেন। দুইটা ঈদ, দুইটা জাতীয় দিবস, এমনকি একুশে। সবাই সেটা জানে। আমিও কখনোই ভুলিনি সেসব রেওয়াজ। তবে এটা ঠিকই চাদর পরে জুবুথুবু হওয়া টেলিভিশনে মানা। কিন্তু একটা ছোট্ট মফস্বলের ময়দানে যেমন-খুশি-পোশাক পরে আসতে কারোরই মানা নেই। অন্ততঃ আমার সেরকমই ধারণা ছিল। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের যে কাউকে দেখেই মনে হলো টিএনও সাহেব আলাদা করে ধামকি দিয়েছেন যেন সবাই ব্লেজার পরে আসেন। শামিয়ানার নিচে যারা আছি তাদের সকলের দিকে এইসব সাহেবেরা ঈর্ষাকাতর চোখে তাকিয়ে আছেন। চকচকে গোলগোল গালে তাঁদের ঈর্ষার ঈষৎ ভাঁজ দেখা যায়। এই শীতের সকালে সকলেই দাড়ি কামিয়ে এসেছেন। অনুমান করা যায় গরম পানি ছাড়াই। এরকম নিষ্ঠা নিয়ে ভাবতে গিয়ে দেখি মৎস্য-কর্মকর্তা গাল চুলকাচ্ছেন। গতকালকেই তাঁর অফিসে তাঁকে দেখে এসেছিলাম আমি। বসতেও এঁরা পারছেন না কখন টিএনও চলে আসেন। এরই মধ্যে মাথাটা ভালমতো চাদরে মুড়ে বাম দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সরু পিচের রাস্তায় টিএনও সাহেবের গাড়ি আসতে দেখলাম। সূর্য ততক্ষণে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু আলো ছাড়াও উত্তাপ ছড়ানো যে তার কাছে কাঙ্ক্ষিত একটা কর্তব্য সে বিষয়ে বিশেষ কোনো গা নেই।

ফকিরহাটে এসেছি গ্রামীণ নারী উন্নয়ন দেখতে। এবং এই উন্নয়ন অবলোকনের বৌদ্ধিক পরিশ্রান্তি-হেতু যৎকিঞ্চিৎ নজরানার ব্যবস্থা আছে আমার। নিন্দুকেরা বলবেন, আমি জানি, যে ওই নজরানার জন্যই আমি ঢাকা থেকে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ফকিরহাটে এসে পৌঁছেছি। কিন্তু এই ভাবনা আমার নিষ্ঠার প্রতি অহেতু কুৎসা হবে। নজরানা আমি ঢাকা বসে থেকেই পেতে পারতাম। কে না জানে ফিল্ড-রিসার্চে রিসার্চ যাই থাকুক বা না-থাকুক, ফিল্ড থাকেই! ফলে 'ফিল্ড-এ্যাসিস্টেন্ট'ও থাকেন। আমাদের এই অবলোকন-প্রকল্পে তাঁদের সংখ্যা তিন। উপরন্তু, 'বিশেষজ্ঞ'দের ফিল্ড পর্যন্ত তাড়া করে যাওয়াটাই বরং সবসময়ে বিশেষ উৎসাহিত করা হয় না। প্রধান কারণ হচ্ছে 'ভেহিকেল'। 'বিশেষজ্ঞ'রা বিশেষ বড়বাজারী না হলে অথঃ ঠিকাদারের পক্ষে একটা 'স্পেসিফাইড ভেহিকেল' সরবরাহ করা আক্ষরিক অর্থেই মুস্কিল হয়। ওদিকে বিশেষজ্ঞ বড়বাজারী হোন বা না-হোন একটা বিশিষ্ট বাহনের জন্য বায়না ধরে বসেন। এই এতকিছু জানা থাকা সত্ত্বেও আমি কোনোকিছুর জন্য বায়না না করে, আসবার বাধ্যবাধকতা নেই জেনেও, একটা বাসে চড়ে যে ফকিরহাটে এসেছি সেটার কারণ হচ্ছে আসলেও আমি 'ফিল্ড' দেখতে চেয়েছিলাম। এবং সেই ফিল্ড মোটেও এই ১৬ই ডিসেম্বরের স্কুল-ময়দান না। এটাই বরং আমার উপরি-ভলান্টিয়ারিং।

পিচের রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমেই টিএনও সাহেবের গাড়ি ভোঁৎ ভোঁৎ আওয়াজ করতে থাকল। এখান থেকেও দিব্যি দেখা যাচ্ছিল টিএনও সাহেবের বিব্রত মুখ। ড্রাইভারকে হাতের ইশারায় থামতে বলে কয়েক গজ আগেই তিনি নেমে পড়লেন। ঝামেলায় পড়লেন স্থানীয় এক রাজনৈতিক নেতা। সানগ্লাস চোখে দিয়ে ধবধবে পাজামা পাঞ্জাবি শাল গায়ে দিয়ে তিনি কেবলই এসেছিলেন। অনেক ভেবেচিন্তেই তিনি সময়টা বের করেছিলেন। সরকারী কর্মকর্তারা দু'কান অবধি হাসি সমেত তাঁর দিকে সকলে এগিয়েও আসছিলেন বটে। সদ্য কামিয়ে আসা গাল ও গলা মিলিয়ে তিনিও একটা দুই ভাঁজ বিশিষ্ট হাসি শুরু করতে যাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে টিএনও'র গাড়ি চলে আসাতে ওই একই হাসি সমেত সবাই সুরুৎ করে গাড়ির দিকে মুখ ফেরালেন। নেতাকে দেখা গেল দ্রুত আগত হাসিখানা খেয়ে ফেলতে, আর পাশের চামুটাদের সঙ্গে কপট ব্যস্ততায় হাত নেড়ে কিছু একটা নিয়ে বলতে। এই নিমরাজি সূর্যের আলোতেও তাঁর হাতের আংটিগুলো ঝিলিক দিতে থাকল। টিএনও গাড়ি থেকে নেমে অবশ্য প্রাথমিক বিপত্তি দ্রুত সামলে ফেললেন। এই নেতার দিকে, এবং ইতোমধ্যেই তাঁর চোখে-পড়া তেমন সাঙ্গপাঙ্গবিহীন আরেক

বর্ষীয়ান নেতার দিকে, যুগপৎ তিনি হাসি মেলে ধরে আসতে থাকলেন। কীভাবে যে একজোড়া চোখ দিয়ে তিনি একজোড়া নেতাকে সামলাচ্ছিলেন তা ভেবে আমার ভারি অবাক লাগছিল। সম্ভবতঃ কর্মকর্তাদেরও তাই লেগেছিল। তাঁরা বিপুল উৎসাহে তখন টিএনও'র হাসির অবিকল অনুরূপ একটা হাসি, কেবল দ্বিগুণ চওড়া, মাখামাখি করে অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতার দিকে ধেয়ে আসতে থাকলেন। নেতার সাঙ্গপাঙ্গরা মাঝখানের এই মুহূর্তগুলো কপাল কুঁচকে ছিল। এক্ষণে তাদের ভাঁজও মিলিয়ে গেলে, টিএনও ও নবীন নেতা যখন করমর্দন করছেন তখন এই বিশ্রি শীতের মধ্যে পকেট থেকে হাত বের করে তারা কর্মকর্তাদের সঙ্গে হস্তমর্দন করতে লাগল। নবীন নেতাকে সেরে টিএনও প্রবীণ, একটু-দুরে-দুরে-থাকা, নেতাতে হাত মেলালেন। নবীন নেতা তখন টিএনও'র যত্ন-করে কামানো গালের দিকে তাকিয়ে আছেন। এই অল্প আলোতেও তিনি আবিষ্কার করে ফেললেন বাম কান আর থুতনির মাঝখানের এলাকায় টিএনও ক'গাছা পশম বাধিয়ে রেখেছেন। বলাইবাহুল্য, নিতান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে। ততক্ষণে কুচকাওয়াজ দলগুলো বেশ নড়ে চড়ে তৈরি। ব্যান্ড-বাজিয়ের দল শিশির-পড়া ড্রামে কয়েকটা প্রস্তুতিমূলক বাড়ি দিয়ে দিল। আওয়াজ উঠল—ঠ্যাপ্, ঠ্যাপ্, ঠ্যাপ্। সে আওয়াজ সামনের খোলাপ্রান্তরের কোনো এক জায়গায় ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে আসল—ঠ্যাপ্, ঠ্যাপ্, ঠ্যাপ্। টিএনও প্রথমে ঠাহর করে উঠতে পারেননি কীসের আওয়াজ। পরে নিশ্চিন্ত হয়ে মঞ্চের দিকে যেতে থাকলেন। আমার তখন ঠক্‌ঠকা অবস্থা। চাদর মোড়ানো মাথাটা বের করে আমি এক কাপ চায়ের জন্য ফ্লাস্কওয়ালা খুঁজতে থাকি।

সকালে বেরিয়েছি সাড়ে পাঁচটার দিকে। মফস্বলের এই কুয়াশামাখানো শীতের মধ্যে সেটা প্রায় মধ্য রাত। সেই সকালে মাথার কাছে রাখা ছোট্ট ঘড়িটা যখন ঘণ্টা বাজিয়ে তুলছে আমাকে, ইচ্ছে হয়েছিল একটা আছাড় মারি। ততক্ষণে মনে পড়ে গেছে এই ময়দানে আমার ফিল্ড-ওয়ার্কের অভীপ্সা। যেন-তেন একটা ব্রাশ করাও সারলাম। কিন্তু ঘর থেকে আর বের হতে ইচ্ছে হয় না। তারই মধ্যে মরিয়ম ঠিকই এক কাপ চা নিয়ে এসে হাজির। ভেজানো দরজায় টোকা দিয়ে সে দাঁড়িয়ে। আমি বিস্মিত, অভিভূত, কৃতজ্ঞ, সন্ত্রস্ত। আসতে বলাতে ভেতরে ঢোকে সে। হাতে তাঁর ধোঁয়া-ছড়ানো কাপ। পিরিচে দু' খানা বিস্কুটও জোগাড় করেছে।

'এত সকালে চা!' কৃতজ্ঞতা বশে বিস্ময়টা প্রকাশ করেই বসি।

'চা তো আপনে শ্যাষ রাত্তিরেও খান। সকালে কী দোষ করল!' মরিয়মও চুপ থাকার পাত্রী না।

'আহা দোষ কে বলল! আমি তো খুশি। খুশি হয়ে বল্লাম।'

'হে আমি জানি।'

'ও। তো ফ্লাস্কেও তো একটু চা ছিল।'

'খান নাই ক্যা? ঠাÉা হয়্যা গেছে না?'

'হ্যাঁ একটু ঠাÉা বোধহয় হয়েছে।'

'এট্টু ঠাÉা বোদয়? এই ফ্ল্যাস্কে তো চা গরম থাহে না।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।'

'হেইডাও আমি জানি।'

মরিয়ম কালকে রাতে ওরই রেখে যাওয়া ফ্ল্যাস্ক নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার কৃতজ্ঞতাবোধ নিয়ে ওর মাথা ঘামাবার দরকার নেই যেন। বারান্দায় দু' পা গিয়েই আবার ফিরে আসে—

'গরম পানি আছে। দিব?'

'না না না...গোসল... এই ঠাÉায়...'

'হ বুঝছি...অনুষ্ঠানে যাইবেন, দাড়ি কাটবেন না?'

'আরে আমি তো আর মেহমান না ওখানে। আমার দাড়ি থাকলে কী?'

মরিয়মের হাত থেকে এ যাত্রা দাড়ি বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম। ও খানিক বিরক্ত মুখেই যায়। অথবা আমাকে দেখায়।

কৃতজ্ঞতা বা বিস্ময়ের যথাযোগ্য কারণ ছিল। দুদিন আগে এসেছি। সন্ধ্যাবেলা পৌঁছানোর পর সহকর্মী তিনজন একটা গোসলখানায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। লাগোয়া-গোসলখানার ঘরখানি যে পদজ্যেষ্ঠতায় আমারই জন্য, এখানে যে এরকম আরেকখানা ঘর নেই বলে তারা

যারপরনাই বিব্রত এবং আমি যা ডিসিশন নিই তাই হবে—এই ধরনের একটা সাধারণ কথা এখানকার ম্যানেজার অনেকক্ষণ ধরে ইনিয়ে বিনিয়ে বলছিল। একটা ছোটখাট যতিচিহ্ন দিলেই কিন্তু আমি বলে দিতে পারতাম আমার এ ঘরে থাকবার দরকার নেই। ম্যানেজার বিচক্ষণ লোক। সে চাইছিল তিনজন অতিথি মহিলা এই ঘরে থাকুক। যেহেতু নারী-উন্নয়ন অবলোকন, অবলোকনের খাঁটিত্ব হেতু 'ফিল্ড'কর্মীরা সবাই নারী। সবাই এসেছে ঢাকা থেকে। ম্যানেজার যদি সেটা নাও ভাবত, ঘটনাচক্রে, আমিও তাই-ই ভাবতাম। যাহোক, ফুরসত পাওয়া মাত্রই আমি এক সঙ্গে বেশ কয়েকবার 'বটেই তো' বলে তার চিন্তাশক্তির তারিফ করতে থাকলাম। আমার উৎসাহ বোঝাতে এরপর আমি যা বললাম তা না বললেই ভাল হতো। আমি বললাম 'তাছাড়া গোসল ফোসলের বালাই আমার নেই।' এই পুরা সময়টা ম্যানেজারের পেছনে জগ-গ্লাস সমেত দাঁড়িয়ে মেহমানদের দেখছিল মরিয়ম। মেহমানদের বললাম বটে, ও এমনিতেও বেশি সময় আমাকেই দেখছিল। গোসলের প্রতি আমার উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে ম্যানেজারকে খামকা হাসতে শোনা গেল। কিন্তু মরিয়মের চোখা নাকটা কিছুতেই ও না কুঁচকে পারল না। ম্যানেজার অবশ্য সেটা দেখতে পায়নি। কিন্তু আমার সহকর্মীরা সবাই সেটা দেখল। যা বোঝার বুঝল।

নিজের ঘরে গিয়ে নেহায়েৎ যা করলে সাফ-সুতরা হয়েছি বলে মনে হয় তাই করে আমি তৈরি হলাম। মানে গ্লাস থেকে পানি নিয়ে চুল ভিজিয়ে একটু আঁচড়ে নেয়ার মতো করলাম। কিছু পরেই রাতের খাবারের ডাক আসে। রাত আটটায় বসে ভাত খেতে যে আমার অনেক ইচ্ছে করছিল তা নয়। এই অফিসের রেওয়াজ অনুযায়ী, যারা এখানেই থাকে তারা সকলে একত্রে খায়। দুপুরে অফিস-সময়কালে তো বটেই। রাতে যারা আবাসিক তারা খায়, আবার ম্যানেজার বা খাজাঞ্চি কাজের চাপে অফিসে থেকে গেলে তারাও খায়। উন্নয়ন কী হচ্ছে তা হয়তো এরা বলতে পারবে না। কিন্তু গাধার খাটুনি-দেয়া একটা কর্মী বাহিনী এনজিও'র আছে। তো এবার দ্বিতীয় রাউন্ড! রান্নাবান্না সেরে খাবার টেবিলে বেড়ে দেয়ার দায়িত্বটাও মরিয়মেরই। সবাই বসেছি। এই সুযোগে ঢাকার খবরাখবর নিচ্ছে স্থানীয় কর্মীরা। সহকর্মী নারীদের পরিবারের খবরাখবরও। দুয়েকজনের উৎসাহী প্রশ্ন খÊকালীন ঘটকালির ইঙ্গিতবহ ছিলও বটে। ঢাকা থেকে আসা নারীকর্মীরা সেগুলো হাসিমুখে সামলাচ্ছে। প্রায় ছাদ-সমান উঁচু একটা টেবিলে রাখা টেলিভিশনে একমাত্র চ্যানেল বিটিভিতে তখন আটটার স্যুটটাই পরে খবর হচ্ছে। এই চলছিল। খাসা রান্না মরিয়মের। আমি জামার বাম হাতায় ঝোল মুছতে মুছতে, মানে নাকের, পরম আনন্দে ভাত খাচ্ছি। আর একটা দুটো কথা বলছি—ফকিরহাট নিয়ে, তাদের চাকরি নিয়ে, এনজিও'র ধারণা নিয়ে, দেশের পরিস্থিতি নিয়ে। ভালই চলছিল। হঠাৎ পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মরিয়ম, যে এতক্ষণ দেখছিল আমাদের আমি হলপ করে বলতে পারি, বেমক্কা একটা কথা পাড়ল।

'হ্যার তো দেহি দাড়ি আছে।'

আরে কী আশ্চর্য! সন্ধ্যাবেলায় এসেছি। দু' ঘণ্টা ধরে দেখছে। দু' ঘণ্টায় কি আমার দাড়ি গজাল? দাড়ি তো ছিলই। আমি সে কথাই বললাম।

'দাড়ি তো বিকালেও ছিল।'

ম্যানেজার খাচ্ছিল আমার মুখোমুখি, টেবিলের অপর পাশে বসে। এতক্ষণে ঢাকা-থেকে-আগত সহকর্মীরা মৃদু একমাত্রার একটা হাসি কোরাসে দিয়ে ফেলেছে। ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে দেখি মুখের মধ্যে বড় একটা গ্রাশ নিয়ে সে চোখ গোল গোল করে স্তম্ভিত হয়ে আছে। আর কারো মুখের দিকে তাকাতে আমার সাহস হচ্ছিল না। ম্যানেজারই যেহেতু প্রধান। মরিয়মের মতো এক রাঁধুনি সহকর্মী যার অফিসে আছে সে নিশ্চয় নানারকম ঘটন বা অঘটন সম্ভাবনায় তৈরিই থাকে। কিন্তু ম্যানেজারের চেহারা দেখে আমার একটুও মনে হলো না যে সে ঢাকা-থেকে-আসা বিশেষজ্ঞের এইমতো একটা হেনস্তা আশা করেছিল। কয়েক সেকেন্ড এভাবে কাটিয়ে ম্যানেজারের মাথায় বুদ্ধি খেলল—

'যাও তো রান্নাঘরে।'

মুখভর্তি ভাত নিয়ে বলতে গিয়ে সে গুটিকতক ভাত আমার প্রান্তে ছিটিয়েও দিল।

'কী কইলাম আমি!'

মরিয়ম ম্যানেজারের ধমক গ্রাহ্য করবার কারণ দেখল না। এতক্ষণে আমারও খানিক জবান ফিরে এসেছে।

'আহা, ঠিকই তো! দাড়ি থাকলে দাড়ি বলবে না? আমার যদি টাক থাকত তাহলে বলত না সে কথা?'

আমার এই ধরনের আশ্বস্তি প্রদানে ম্যানেজারকে কেবল আরো আতঙ্কিতই দেখাল। পরে, রাতে যাবার আগে ম্যানেজার আমাকে পরিস্থিতিটা বোঝাতে ঘরে আসল একদফা। মুখে অবশ্য বলল যাবার সময় দেখা করতে এসেছে।

'বুঝলেন না ভাই! আমাদের এখানে তো ঢাকা থেকে অডিটে কেউ আসে না। ডিস্ট্রিক্ট লেভেল পর্যন্ত।'

'না না আমি অডিটে আসিনি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ কনসালটেন্ট। তারাও আসে না।'

'সেরকম কিছু না। আমি ছোট কনসালট্যান্ট। আমার ইচ্ছে ছিল আপনাদের অফিস দেখা।'

'সে আমাদের ভাগ্য।'

'এইগুলা কী বলেন?'

এই রকমের একটা উভকষ্ট আলাপ শেষে তার বাসায় ফেরা হলো। লোকটা আসলেই ম্যানেজার – ক্লান্তিহীন, নিষ্ঠাবান, সম্ভাব্য ঝামেলা মেটাতে সজাগ। অডিটর ঠাওরানোতে মনটা আমার খানিক দমে ছিল। এরই মধ্যে রাত এগারোটার দিকে দরজায় টোকা।

'আপনে রাত্তিরে গুমান না হুনলাম।'

'কে বলল?' তড়িঘড়ি করে লেপ ছেড়ে দরজা খুলে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হেই মায়্যারাই তো কইল।'

'ও। না ঘুমাই তো।'

'না গুমাইয়া তো শরিল বানাইছেন এইরম।'

'না না ঠিক আছে।'

'হ ঠিক আছে! রাত্তিরে চা খান হুনি।'

'হ্যাঁ তা খাই।'

'রাত্তির উজাগার কইরা চা খাইলে প্যাট পইচা মরবেন তো।'

'তাই নাকি? কিন্তু এখন তো আর খাচ্ছি না।'

'নিয়া আসচি।'

এতক্ষণে খেয়াল করলাম চাদরের পাশ থেকে ফ্ল্যাস্ক বের করছে মরিয়ম। আমি ওর বকাঝকা খেয়ে বেকুবের মতো দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ফ্ল্যাস্ক দেখে তাড়াতাড়ি হাত বাড়ালাম।

'এইহানে দুদ নাই। আপনেরে দুদ চা দিতে পারলাম না।'

মরিয়ম চলে গেলে তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাস্কের মুখে চা ঢালতে থাকি। ঘন কাল রঙের একটা দ্রবণ। দেখলেই সারিবাদি সালসার কথা মনে হয়। চুমুক দেবার আগে ভাবলাম পেট পচে যাতে না মরি সেজন্য কোনো কবিরাজী পথ্যই হয়তো বানিয়েছে মরিয়ম। এতকিছু যে লোক ছোট্ট রান্নাঘরটা মনিটর করছে থেকে তার পক্ষে এটা সম্ভব। চুমুক দিয়ে নিশ্চিত হলাম ও প্র্যাগম্যাটিক গোত্রের মানুষ। এমনকি অস্তিত্ববাদী। চায়ের মতো একটা তুচ্ছ জিনিস খেয়ে পেট পচিয়ে আমি যদি মারা যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতেই পারি, তাহলে মরিয়মও সেই সিদ্ধান্ত আমারই বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুদায়ী বস্তুটা যথাসাধ্য অকৃপণভাবে এই দ্রবণে মিশিয়ে দিয়েছে। সারিবাদি সালসা নয়, খেতে গিয়ে আমার চিরতার পানির কথাই মনে হয়েছে। সন্ত্রস্ততার কারণও সেটা।

এই দু'দিনে মরিয়মের চা বানানো, আর ফ্ল্যাস্কে ভরে দিয়ে যাওয়া ছাড়াও একাধিক বার দাড়ির প্রসঙ্গটা ও তুলতে চেষ্টা করেছে।

'অপিচার মানুষ! এইরম দাড়ি থাকলে কেমুন দ্যাহায়!'

ও নিশ্চিত ছিল এই চা-বানিয়ে দেবার বাৎসল্যে এসব কথা বলতেই পারে। আমিও নিশ্চিত ছিলাম চা-বানিয়ে দেবার খাতির যখন করছে তখন তেমন কথা না বাড়িয়ে হ্যা হ্যা করে হাসলেই পার পাওয়া যাবে। পরের রাতে বললাম—

'ক্যান আপনার স্বামীর দাড়ি নাই?'

'কী কয়! ব্যাডা থাকলে শ্যান দাড়ি! মরছে কবে! হেই দুঃখের কতা আর তুইল্যেন না।'

‘ওহো হো! আমি তো জানতাম না। ঠিকই তো, থাকলে তবেই না দাড়ি!’

‘কই নাই তো জানবেন ক্যামনে? আর হেই ব্যাডা থাকলেও দাড়ি রাখত না আপনের নাহান। জোয়ান ব্যাডা!’

মরিয়া একটা উত্তেজনা নিয়ে স্কুলের মাঠে এসেছিলাম। ফ্ল্যাস্কওয়ালার কাছে চা খেতে খেতেই সেই উত্তেজনা ছুটে গেছে। এরই মধ্যে মৎস্য সাহেব একগাল হাসি দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকলেন। চিনে ফেলেছেন। ভুর ভুর করে চায়ে চুমুক দিয়ে তাঁকে বলি—‘চা খান।’

তিনি আমার হাতের কাপের দিকে তাকিয়েই পাশে কান-ঢাকা চা-ওয়ালা ছেলেটার দিকে তাকালেন। মুখে বললেন—

‘দেরি হয়ে যাবে, স্যারেরা সব দাঁড়িয়ে আছেন।’

টিএনও সাহেব সত্যি সত্যিই ততক্ষণে মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে সকল ধরনের সহকর্মী খুঁজে পেতে ইতিউতি তাকাচ্ছেন। মৎস্য-কর্মকর্তা যাবার জন্য ত্রস্ত রওনা দিতেই খেয়াল করি ঘাড়ের কাছে তাঁর টুথপেস্ট লেগে। কিছুতেই বুঝে পেলাম না এইরকম দুরূহ জায়গায় দাঁতমাজা পেস্ট লাগালেন কীভাবে তিনি। দুই মুহূর্ত দ্বিধা করে নেহায়েৎ ভদ্রতাবশতঃ বলেই বসি—

‘আপনার ঘাড়ে টুথপেস্ট লেগে।’

‘বলেন কী?’ ঠিক একই বেগে আমার দিকে মুখ ফেরান তিনি। তাঁকে বেশ হতভম্ব দেখায়। হাতে সেই পেস্ট লেপ্টে এনে বলেন –

‘ও! আফটার শেভ জেল।’

এবারে তাঁকে খানিক খুশি দেখাল।

‘ও! তাই নাকি! পেস্টের মতো দেখায় কিন্তু।’

একথা শুনে তিনি আমার দিকে তাকালেন নেহায়েৎ অখুশি-চোখে। তারপর প্রায় ভালরকম কোনো বিদায় না নিয়েই তিনি দৌড় লাগালেন মঞ্চের দিকে।

মনটা বেশ দমে গেছে। কুচকাওয়াজ খানিকক্ষণ দেখে আমি রিকশা নিয়ে বাজারের দিকে রওনা হই। পরাটার গন্ধে ফকিরহাট বাজারের মোড়টা যেখানে ম’ ম’ করছে সেখানে রিকশা থামাই।

এদিক সেদিক চক্কর মেরে দুপুরের ঢের পরে অতিথিশালায় ফিরে নিছকই নিয়মরক্ষার ভাত খেতে বসেছি। আজকে আমি একাই। সকলেই নির্দিষ্ট সময়ে খেয়ে ফেলেছে। ঢাকনা ঢাকা খাবার টেবিলে দেখে স্বস্তি পেলাম—আশপাশে কেউ নেই। প্লেটে যেই না খাবার বাড়তে গেছি—

‘ওই পেলেট রাহেন। ধোয়া পেলেট আনছি।’

যে ভয় পাচ্ছিলাম! আমি ওর হাতের দিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখি। না, প্লেট ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু দাড়ি কামাবার চাকু-কাঁচি নিয়ে আসলে অবাক হবার কিছু ছিল না। আজ ছুটির দিনে মাথা ন্যাড়া করে দিলেও বেশি লোক সাক্ষী নেই। মাথা নিচু করে যথাসম্ভব দ্রুত খেতে থাকি। কিন্তু অবাক কাÉ, মরিয়ম বিশেষ কিছুই বলল না। কেবল আমি হাত ধোয়ার জন্য উঠলে, প্লেট সরাতে সরাতে একবার টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলল—

‘কেমুন দ্যাহায়!’

দিবানিদ্রা হারাম নীতিতে বহুবছর অবিচল আছি আমি। কিন্তু হলে কী হবে! ফকিরহাটের নরম শীতে প্রতিদিনই ঢুলি। ‘ফিল্ডে’ গেলে চক্ষুতে লজ্জা নিয়ে ঘুম তাড়াই। কী করা! কিন্তু আজ প্রায় শেষ রাত্তিরে মরিয়মের চা খেয়ে বেরিয়েও, এই পড়ন্ত বিকেলে একা ঘরের মধ্যে না ঘুমিয়ে আর পারা গেল না। আমি অবশ্য বই পড়তেই শুরু করেছিলাম। ঘুম ভাঙল দরজার বাইরে ঢাকাই সহকর্মী কারো ডাকাডাকিতে—

‘শিগগির ওঠেন। সাদ্দামকে ধরে ফেলেছে।’

আমি ঘুম ভেঙে ছাদের দিকে তাকিয়ে ফ্যালফ্যালেভাবে ফকিরহাটের সহকর্মীদের মধ্যে সাদ্দাম নামে কাউকে হাতড়াতে চেষ্টা করি। জিজ্ঞেসও করি—

‘সাদ্দাম কে?’

কিন্তু উত্তর দেবার জন্য ওদিকে আর সে তখন নেই। ততক্ষণে সাদ্দামকে চিনতে পেরে ধড়মড় করে উঠে টিভি ঘরে ছুটি। টেলিভিশনের পর্দায় সকলের চোখ। ঢাকাই সহকর্মীরা ছাড়াও মরিয়ম, মরিয়মের এক বান্ধবী, এই অফিসেরই কেউ হবে, আগে খেয়াল করিনি, আর এ্যাকাউন্ট্যান্ট সাহেব। বিদেশি কোনো চ্যানেলের খবর বিটিভি দেখাচ্ছে। বুলেটিনের মতো। মার্কিন সেনাবাহিনীর মুখপাত্র সাদ্দামকে ধরবার গল্প শোনাচ্ছে। আর টেলিভিশনে সাদ্দামের মুখ।

সাদ্দাম হোসেন! মুখভর্তি দাড়ি। চুল উস্‌কো খুস্‌কো।

'ও আল্লা! হেই ব্যাডাও দেহি দাড়ি রাখছে।' মরিয়ম পাশ থেকে আর্তনাদ করে ওঠে।

আবার মার্কিন কর্মকর্তা আসে। বুঝিয়ে বলে কীভাবে তারা নিশ্চিত হয়েছে যে এটা সাদ্দামই। তাদের জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার কিয়দংশ বলে, আবার সরেজমিন দেখায়।

সাদ্দাম হোসেন! মুখে দাড়ি নেই। চুল মোটামুটি পরিপাটি।

আবার সাদ্দাম হোসেন! মুখভর্তি দাড়ি। চুল উস্‌কো খুস্‌কো। ... ধারাভাষ্য চলছে।

আবার সাদ্দাম হোসেন! মুখে দাড়ি নেই। চুল মোটামুটি পরিপাটি।
বারবার সাদ্দাম হোসেন! মুখভর্তি দাড়ি। মুখে দাড়ি নেই। চুল উস্‌কো খুস্‌কো। চুল মোটামুটি পরিপাটি।

১৬ই ডিসেম্বরের রাত্রিবেলা সহকর্মীরা সকলে একত্রে খাবে। একেক জন কেবল এই জন্যে এসে ঢুকছে। ঢুকছে, কিন্তু চোখ সকলের টিভির পর্দায়। ম্যানেজার, কো-অর্ডিনেটর, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সবাই।

পাশাপাশি সাদ্দাম হোসেন! মুখভর্তি দাড়ি। মুখে দাড়ি নেই। চুল উস্‌কো খুস্‌কো। চুল মোটামুটি পরিপাটি।

এবার সাদ্দাম হোসেনের জিভ! এবার সাদ্দাম হোসেনের দাঁত!

টিভি পর্দায় সাদ্দাম হোসেন উন্মোচিত হতে থাকল মার্কিন বাহিনীর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। আর এদিকে সহকর্মীরা নানারকম এলোমেলো পর্যালোচনা করছে। সেসব কথা ঠিকমতো আমার কানেও যাচ্ছে না। কিন্তু গড়পরতায় সবাই খানিক বিহ্বল যেন। এমনকি মরিয়ম, খাবার না-বেড়ে টেলিভিশনের পর্দায় লেগে আছে।

কোনো এক সময়ে কারো মনে পড়ল খাবার কথা। ৮টার খবরও শেষ হবার পথে। সাদ্দাম টেলিভিশন থেকে অপসৃত হয়ে মার্কিন বাহিনীর একচ্ছত্র অধিকৃত হয়েছে। এর মধ্যে আমরা খাওয়া দাওয়া সেরে উঠি। মরিয়ম অনেকক্ষণ থেকে কড়া নজরে রেখেছে আমাকে। সেটা জেনেও মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করছে না। কেউই কাউকে খাওয়া নিয়ে কিছু বলছে না। কেবল নিজে নিজে খাচ্ছে। হাত ধুতে উঠলে মরিয়ম বলে—

'খাইলেন না ক্যা কিছু?'

'শরীরটা ভাল নেই আজ।' আমি অন্যদিকে তাকিয়ে বলি।

প্রায় নিঃশব্দ একটা বিদায়ে যে যার মতো চলে গেল। আমিও ঘরে ফিরি।

ঘরে এসে কাঠের চৌকিটাতে বসে আবিষ্কার করি কেমন একটা ভোঁতা অবসন্ন মাথা। কিন্তু সেটার কারণ যে কী বুঝে উঠতে পারি না। দুপুরে ঘুমিয়েছি বলেই কি? কে জানে! কতক্ষণ এভাবে বসে আছি জানি না। হঠাৎই মনে হলো ঝিঁ ঝিঁ পোকারা একটানা ডাকছে। সে কি! ফকিরহাট শহর থেকেও দুই কিলোমিটার দুরের এই অতিথিশালায় ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক আজই প্রথম! আমি দরজা খুলে বাইরে আসি। বারান্দাটা অন্যদিনের থেকেও অন্ধকার। যে যার মতো বাড়ি চলে গছে। আর ঢাকাই সহকর্মীদের ঘরে তখনো আলো। কেউ একজন প্লেয়ারে গান শুনছেও মনে হলো। ওপারের বারান্দায় আলো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মরিয়ম। ওর দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ, আসলে আমার ঘরের দিকে। এক্ষণে আমার দিকেই। আমি আবার ঘরে ফিরে আসি।

টিভি পর্দায় সাদ্দামের মুখটা ফিরে ফিরে আসছে। দাড়িছাড়া! দাড়িওয়ালা! মার্কিন মুখপাত্রের পাথুরে মুখগুলোও ফিরে ফিরে আসছে।

আমি চৌকির নিচে আমার ব্যাগটা বের করতে বসি।

বাথরুম থেকে ফিরে ঘরে ঢুকবার কিছুক্ষণ পরেই দরজায় টোকা। দরজা খুলতে উঠতে যাচ্ছি। ভেজানো দরজা খুলে মরিয়ম ঢোকে। ওর হাতে কাপ পিরিচ।

'আপনে আমার উপরে রাগ কইরে দাড়ি কাটলেন?'

'হুঁম। না তো। এমনিই।'

'আপনেরে কিন্তু সোন্দর লাগে দাড়ি কাটলে।'

'তাই?'

আমি হাসার চেষ্টা করি। মরিয়ম চায়ের কাপ নামায় না।

'কী দিয়া কাটলেন?'

'একটা ব্লেড ছিল। রেজর তো নেই।'

'আমারে বলতেন। কিন্যা আনাইতাম।'

'না সমস্যা হয়নি।'

'ফ্যানা দ্যান নাই?'

'সাবান দিয়েছি।'

মরিয়ম আমার দিকে তাকিয়ে দেখে।

'আইজগা এক কাপ চা।'

মরিয়মের মুখে বিরল একটা হাসি। কৌতুক, কিংবা বাৎসল্য। কিংবা দুটোই।

'অসুবিধা নাই।'

'আইজগা আপনের দুদ চা। আমি আনায়া রাখছিলাম।'

প্রকাশনা সূত্র

আলী বিহারীর কম্বল: *কবিসভা* গদ্যসঞ্চালন ৬ [ব্রাত্য রাইসু সঞ্চালিত]॥ *একুশের সংকলন*, ক্রোড়পত্র বইমেলা ২০০৬ [মারুফ রায়হান সম্পাদিত]

কুমড়া: *স্রোতচিহ্ন*, ৩য় সংখ্যা, ২০০৫ [সুমন সুপান্থ সম্পাদিত] ॥ *কৃত্তিবাস*, ২য় গল্পসংখ্যা, ২০০৬ [সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত]

একটি [জাপানী] মোরগ কাহিনী: সাহিত্য সাময়িকী, দৈনিক *প্রথম আলো*, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৬?

ওস্তাদ: মীজানুর রহমানের *ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, সংখ্যা ৭৪

পাখিসংক্রান্ত একটা গল্প: সাহিত্য সাময়িকী, দৈনিক *প্রথম আলো*, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪

সাহেবালির ঘোড়ারোগ: ঈদসংখ্যা *একাত্তর*, ২০০৬

বিরুদ্ধাচরণ: *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা*, সংখ্যা ৭৫ [মশিউল আলম সম্পাদিত]

ময়নাতদন্তহীন একটি মৃত্যু: ওয়েবজিন *পরবাস*, সংখ্যা ৩৫, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২; www.parabaas.com [সমীর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত]

দাড়ি কামাবার জন্য শুভক্ষণ: *কবিসভা* সঞ্চালিত গদ্যসঞ্চালন ৬ [ব্রাত্য রাইসু সঞ্চালিত]॥ কালের খেয়া, দৈনিক *সমকাল*, ১৮ নভেম্বর ২০০৫